ডিসেম্বর ২০০৬ ● দশ টাকা

আনন্দমেলা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
মজাদার গল্পের দুর্দান্ত কমিক্‌স
বিপিনবাবুর বিপদ
(শেষ কিস্তি)

ই-মেল করো বাংলায়

চারটি জমজমাট গল্প

বুদ্ধিমান গাড়ি ● খেলাধুলোয় একটি বছর ● সাইনা নেহওয়াল

গানের জগতে 'লিট্‌ল চ্যাম্প' সঞ্চিতা

সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস
কানামাছি
(শেষ কিস্তি)

Hard Copy & Scan - Debasish Roy
Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

Dabur
www.dabur.com
এবার আপনি বাঁচুন প্রাণভরে
কেননা টেনশন থাকবে দূরে
Dabur®
ChyawanShakti™
Ashwagandha,
Kesar & Draksha
ডাবর চ্যবনশক্তির অশ্বগন্ধা এবং কেসর শক্তি, দেয় টেনশন থেকে মুক্তি।
আজকের এই ব্যস্তসমস্ত অ্যাকটিভ জীবনযাত্রার নতুন অবদান হল টেনশন। 24 ঘণ্টার মধ্যে অফিস, বাড়ি, বাচ্চা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধব সামলানোর চেষ্টা আমাদের শারীরিক এবং মানসিক দু দিক থেকেই নিস্তেজ করে দেয়। ফলে, না অফিস সামলানো যায়, না ঘর।
এই টেনশন যাতে আপনার জন্যে মুশকিল না হয়ে ওঠে তার জন্যে ডাবর রিসার্চ ফাউন্ডেশনের আয়ুর্বেদ এক্সপার্টস্‌গণ বিশেষভাবে আপনার জন্য তৈরী করেছেন 46 টি বাছাবাছা গুণেভরা প্রাকৃতিক উপাদান যুক্ত অশ্বগন্ধা, কেসর সমৃদ্ধ ডাবর চ্যবনশক্তি। প্রতিদিন এর দু চামচ আপনাকে শক্তি দেবে আর করে তুলবে আপনাকে একদম অ্যাকটিভ যাতে টেনশন থাকে দূরে আর আপনি জীবনকে উপভোগ করতে পারেন প্রাণভরে।
কেসর ঃ একটি অ্যান্টি অক্সিডেণ্ট, রুচিকর এবং উদ্দীপক।
অশ্বগন্ধা ঃ শারীরিক শক্তি বাড়ায় এবং মানসিক টেনশনকে দূর করে। পিত্ত ও কফ-এর দোষকে ভারসাম্য যুক্ত রাখে।
Dabur® ChyawanShakti™
টেনশন থাকে দূরে, আপনি বাঁচেন প্রাণভরে।
টেনশন সামলানোর বিশদ তথ্য সূচনার জন্য আমাদের স্বাস্থ্য বিশেজ্ঞদের stresscarenaturally@dabur.com তে ই.মেইল করুন অথবা ডাবর চ্যবনশক্তি, ডাবর ইণ্ডিয়া লি., পো.অ. বক্স নং 3, সাহিবাবাদ, গাজিয়াবাদ, 201010 (ইউ.পি) কে লিখুন।

আনন্দমেলা

৩২ বর্ষ ৮ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৪১৩ ডিসেম্বর ২০০৬

সাক্ষাৎকার

গানের জগতে 'লিট্‌ল চ্যাম্প' সঞ্চিতা ৫৬

হাওড়ার চ্যাটার্জি হাট গার্লস স্কুলের যে-কোনও ফাংশানে গান গাওয়ার জন্যে ওর নাম ছিল বাঁধা। এমনকী পাড়ার ফাংশানেও। পড়ার ফাঁকে মা-বাবার কাছে গান শিখেছে। সারাদিনে একবার না একবার গান গাইতে বসে এখনও। সঞ্চিতা এখন ক্লাস নাইনে পড়ে। এবার 'সা রে গা মা পা লিট্‌ল চ্যাম্প' শিরোপা জিতে সঞ্চিতা এখন শিরোনামে। সঞ্চিতার সঙ্গে রাই সেনগুপ্তের একান্ত সাক্ষাৎকার।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মজাদার গল্পের জমজমাট রঙিন কমিক্‌স

বিপিনবাবুর বিপদ ১৯ (শেষ কিস্তি)

এত দিন পর মানুষ তাকে ভূত ভাবতে শুরু করেছে জেনে পীতাম্বর খুশি। রামভজনবাবুর সঙ্গে বিপিনবাবু চলেছেন মধুবনির জঙ্গলে। রামবাবুর ডেরায় পৌঁছনোর পর বিপিনবাবু দেখলেন, দরজায় তালা দেওয়া নেই। তারপর একটা লোহার ঢাকনা খুলে নামতে লাগলেন দু'জনে। নীচে নেমে দেখলেন মোহর ভর্তি সাতটা ঘড়া আর সাতটা কলস।

কী ঘটল তারপর...

ছবি: স্বপন দেবনাথ

অন্যান্য পাতায়

ডাকবাক্স ৪
পাঠকের পাতা ৫
বিজ্ঞানের টুকিটাকি ৭
প্রযুক্তিবিজ্ঞান ৩৫
কুইজ় ৩৬
ক্যাম্পাস ৩৭
অমিল খোঁজো তফাত বোঝো ৫৮
হাসছি দ্যাখো ৫৮
অর্থ শেখো, শব্দসন্ধান ৫৯
নানারঙের রামধনু ৬০

সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস (শেষাংশ)
কানামাছি
তুষারকান্তি ভট্টাচার্য ৩৮

প্রচ্ছদের ফোটো: রণজিৎ নন্দী

সম্পাদক: পৌলোমী সেনগুপ্ত সরকার

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: ত্রিপুরা, আন্দামান, মণিপুর এক টাকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত।

খেলাধুলো

নতুন তারকা জীব মিলখা সিংহ ৬২ শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
বিশ্বজয়ের স্বপ্নে সাইনা ৬৩ তানাজী সেনগুপ্ত
খেলাধুলোয় একটি বছর ৬৪ সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়
ফ্রিস্টাইল ৬৬ চন্দন রুদ্র

চারটি গল্প

গোবর্ধন প্লাস হারাধন ৮ গৌতম দাশগুপ্ত
চকদিঘির ভূতপরি ১৪ সুব্রত হালদার
অসুরগড়ের অদ্ভুত সাপ ৩২ সমীরকুমার ঘোষ
কেরোসিনে কম্পিউটার ৫০ সৈকত মুখোপাধ্যায়

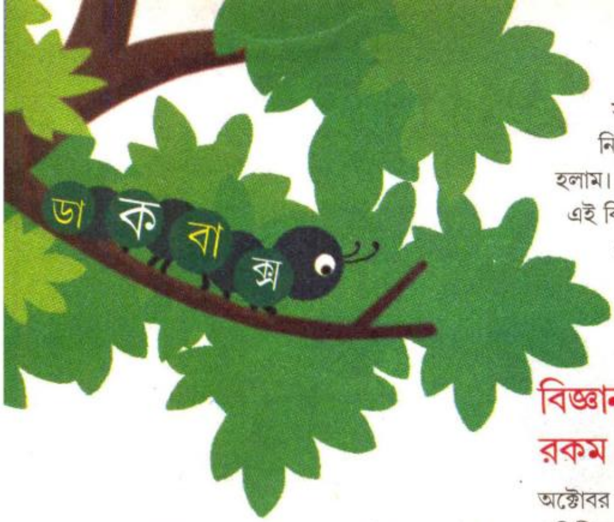

খেলোয়াড়দের পোস্টার চাই

আমরা নিয়মিত 'আনন্দমেলা' পড়ি। তবে ইদানীং এই পত্রিকা পড়তে বিশেষ ভাল লাগছে না। আমাদের দাবি, আনন্দমেলার প্রতি সংখ্যায় একজন খেলোয়াড়ের পোস্টার ছাপা হোক। 'হাসছি দ্যাখো' বিভাগটি আর-একটু বড় হলে ভাল লাগবে। 'বিজ্ঞানের টুকিটাকি' বিভাগটিও বেশ ছোট, এই বিভাগটিও বাড়াতে হবে। এই পত্রিকায় বিভিন্ন বিশ্বরেকর্ড সম্পর্কে তথ্য দিলে খুশি হব।

শুভ্র সাহু এবং ইন্দ্রনীল সেন
চতুর্থ শ্রেণি, পুরুলিয়া জিলা স্কুল

আই সি সি ট্রোফি বাদ কেন

আমি 'আনন্দমেলা'র নিয়মিত পাঠক। এটি আমার সবচেয়ে প্রিয় পত্রিকা। নভেম্বর সংখ্যায় আই সি সি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফি নিয়ে কোনও লেখা না দেখে অবাক হলাম। আশা করি, পরবর্তী কোনও সংখ্যায় এই বিষয়ে লেখা ছাপা হবে।

রাজর্ষিরঞ্জন ভট্টাচার্য
সপ্তম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, বিবেকনগর, ত্রিপুরা

বিজ্ঞান নিয়ে চাই অনেক রকম লেখা

অক্টোবর সংখ্যা 'আনন্দমেলা'য় 'আশ্চর্য পৃথিবী'তে স্টিভ আরউইন সম্পর্কে আরও তথ্য দিলে ভাল লাগত। 'বিজ্ঞানের টুকিটাকি' বিভাগে ক্রায়োনিক্স পদ্ধতি ও ফিলিপ রোডস সম্পর্কে আরও তথ্য দিলে ভাল হত। 'বিপিনবাবুর বিপদ' কমিক্‌স আকারে পেয়ে ভালই লেগেছিল প্রথম দু'টি সংখ্যায়, তবে নভেম্বর সংখ্যা পড়ে খুব একটা ভাল লাগল না। 'পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা'র মতো ফেলুদা-গল্পের কমিক্‌স মাসিক আনন্দমেলায় ছাপা হলে খুব ভাল হবে। আনন্দমেলার মতো পত্রিকায় বিজ্ঞান নিয়ে আরও বেশি তথ্য থাকা উচিত। নভেম্বর সংখ্যায় 'পুরস্কার' বিভাগে শুধুমাত্র বিজ্ঞানে নোবেলের কথাই লেখা হল কেন? মুহাম্মদ ইউনূস ও তাঁর কাজ সম্পর্কে তথ্য দিলে অনেক বেশি ভাল লাগত।

রেন রায়
একাদশ শ্রেণি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ইনস্টিটিউশন

হ্যারি পটারের কমিক্‌স

'আনন্দমেলা'য় হ্যারি পটারের ছবি এবং কমিক্‌স দেখতে চাই। হ্যরি পটারের প্রতিটি বই সম্পর্কে বিবরণ চাই-ই-চাই!

শারদীয়া ঘোষ
ষষ্ঠ শ্রেণি, বাগবাজার মালটিপারপাস গার্লস স্কুল

জমজমাট ফেলুদা কমিক্‌স

'পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা'য় সত্যজিৎ রায়ের লেখা 'দার্জিলিং জমজমাট' কমিক্‌সের আকারে পেয়ে দারুণ লাগল। বিশেষ করে কমিক্‌সের ছবি আমাকে আনন্দ দিয়েছে। এই রকম আরও গোয়েন্দা কমিক্‌স মাসিক আনন্দমেলায় পেলে ভাল লাগবে।

সৌম্যদীপ মণ্ডল
পঞ্চম শ্রেণি, সেনের ডাঙা রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির, বর্ধমান

চাই হাসির এবং ভূতের গল্প

কয়েকটি সংখ্যা ধরে লক্ষ করছি যে, 'আনন্দমেলা'য় হাসির গল্প একেবারেই ছাপা হচ্ছে না। ভূতের গল্পও অনেক দিন পাচ্ছি না আনন্দমেলায়। অগস্ট সংখ্যায় 'নাঙ্গা পাহাড়ের মমি' গল্পটি ভাল লেগেছিল। পরবর্তী কোনও সংখ্যায় হাসির গল্প এবং ভূতের গল্প ছাপা হোক।

অভিরূপ মজুমদার
নিউ ব্যারাকপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা

প্রসঙ্গ: স্লিপ ডক্টর

অগস্ট সংখ্যায় 'বিজ্ঞানের টুকিটাকি' বিভাগে 'রাতে নিশ্চিন্ত ঘুম এনে দেবে আশ্চর্য বালিশ স্লিপ ডক্টর' পড়েছি। এই বালিশ কোথায় পাওয়া যায় এবং এর দাম কত, তা জানতে চাই।

দিলীপকুমার ভুঁইয়া
সিংদা

পত্রিকা ভাল লাগলে জানাও, খারাপ লাগলেও। ডাকে তো বটেই, এখন চিঠি পাঠাতে পার 'ই-মেল'-এও।
ঠিকানা:
anandamela@ abpmail.com
লেখকের স্কুলের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।

সম্পাদকীয় উত্তর: 'স্লিপ ডক্টর' পাওয়া যায় জাপানসহ এশিয়া ও উত্তর আমেরিকার কয়েকটি দেশে। জাপানে এর দাম পড়বে ৪৫,০০০ ইয়েন (৩৯২.৪০ মার্কিন ডলার)। স্লিপ ডক্টর সম্পর্কে বিশদ জানতে হলে সার্চ ইঞ্জিন google-এ গিয়ে 'sleep doctor & lofty' টাইপ করে সার্চ দিতে হবে।

ভাল লাগে বিশেষ গল্প সংখ্যা

আমি এখন দশম শ্রেণিতে পড়ি। নিজে-নিজে পড়তে পারার সময় থেকেই আমি 'আনন্দমেলা' পড়ি। আনন্দমেলা আমার খুব ভাল লাগে। সবচেয়ে ভাল লাগে বিশেষ গল্প সংখ্যাগুলো। খেলার পাতা, বিশেষ করে 'ফ্রিস্টাইল' থেকে অনেক কিছু জানতে পারি।

ময়ূরী দাশগুপ্ত
দশম শ্রেণি, আদর্শ বিদ্যানিকেতন, ই-মেল মারফত

'টিনটিনের সঙ্গে কাল্পনিক সাক্ষাৎকার'

প্রতিযোগিতার ফলাফল।

পাঠকের পাতা

১

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যেখানে ব্যাটে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন, সেই টনটন-এ বাবা-মা'র সঙ্গে এবার গিয়েছিলাম শীতের ছুটি কাটাতে। সেখানে একদিন সকালে পার্কে ঘুরতে-ঘুরতে দেখা হয়ে গেল আমার স্বপ্নের কমিক হিরো টিনটিনের সঙ্গে। সে তার সেই চেনা পোশাক পরে, সঙ্গী কুকুর কুট্টুসকে নিয়ে আমার দিকেই আসছিল। কাছে এসে একগাল হাসল। তারপর আমার সঙ্গে হাত মেলাল। হেসে বলল, "ভারত নামে দেশের কথা অনেক শুনেছি। আমার খুব ভাল লাগে দেশটাকে। ভারতবাসীদের কত কীর্তির কথা শুনেছি। আমি কোনওভাবে সাহায্য করতে পারি কি?"

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল এশিয়ার প্রথম নোবেল প্রাইজ় হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাটা। বললাম, "টিনটিন, আমাদের প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল প্রাইজ়, যা প্রতিটি ভারতবাসীর গর্বের বস্তু, তা চুরি হয়ে গিয়েছে শান্তিনিকেতন থেকেই। তুমি সেই নোবেল প্রাইজটা উদ্ধার করে দিতে পার?"

টিনটিন আমাকে কথা দিয়েছে, সে ওটা খুঁজে দেবে। সুতরাং আমরা আশা করে থাকতেই পারি!

সৌভিক কুণ্ডু
ষষ্ঠ শ্রেণি
হিন্দু স্কুল, কলকাতা

২

শীতের সকাল। সকলে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ ঘেউ ঘেউ আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। আমাদের বাড়ির কুকুরটা ঝগড়া করছে অন্য কোনও কুকুরের সঙ্গে। ঘরের দেওয়ালে টাঙানো টিনটিনের ছবিটার দিকে তাকাতেই দেখলাম, ছবিটা উধাও! সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ছোটখাটো একজন মানুষ। পায়ে বুট আর মোজা, গায়ে নীল শার্ট আর বারমুডা। গলায় টাই আর মাথায় ঠিক কমিকসের টিনটিনের মতো চুল। চোখ কচলে দেখলাম, টিনটিনের মতো চুল শুধু নয়, এ তো জলজ্যান্ত টিনটিন! সঙ্গে কুট্টুস! এতক্ষণে ঘেউ ঘেউ রহস্যের সমাধান হল। স্কুলের লাইব্রেরি থেকে টিনটিন সিরিজের 'নীলকমল' নামে যে বইটা এনেছিলাম ক'দিন আগে, সেটা খুঁজে পাচ্ছি না। টিনটিনকে বললাম, "হাই টিনটিন, তুমি তো অনেক রহস্যের সমাধান করেছ। অনেক দুঃসাহসিক অভিযানও করেছ। পারবে, আমার প্রিয় বই নীলকমল খুঁজে দিতে?"

টিনটিন বলল, "নিশ্চয়ই, এটা না পারার কী আছে? কিন্তু তার আগে তুমি রেডি হয়ে নাও।"

হঠাৎ মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, টিনটিনের ছবিটা হাওয়ায় দুলছে।

সপ্তপর্ণী দে
ষষ্ঠ শ্রেণি
বড়িশা গার্লস হাই স্কুল, কলকাতা

৩

এক শীতের সকালে টিনটিন পড়ছিলাম, আর ভাবছিলাম হঠাৎ যদি টিনটিনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তো কেমন হয়! হঠাৎ দেখি জনসন আর রনসন আমার দিকে ছুটে আসছে। এসেই আমার হাতটা চেপে ধরে চেঁচাতে লাগল, "পেয়েছি, পেয়েছি, এই সেই বিচ্ছু।"

এই যাঃ, আমি তো কোনও অন্যায় করিনি। এমন সময় টিনটিনের আবির্ভাব। টিনটিনকে দেখে ওরা বলে উঠল, "এই যে টিনটিন, এই সেই পাজিটা!"

"উঁহু, কোথাও একটা ভুল হয়েছে, এ তো সেই বিচ্ছুটা নয়!" টিনটিন বলল।

ওরা ছেড়ে দিল আমাকে। হঠাৎ ক্যাপ্টেন হ্যাডকের চিৎকার, "বিদ্‌ঘুটে, বকচ্ছপ, পচা শসা! এইমাত্র ওরা পালিয়ে গেল!"

শুনেই টিনটিন আর জনসন, রনসন দৌড়ল। আমি চিৎকার করে বললাম, "টিনটিন, টিনটিন, একটু দাঁড়াও।" নিজের চিৎকারে নিজেরই ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, কোথায় টিনটিন, কোথায় কী! ইস, যদি আর-একটু সময় পেতাম, তা হলে টিনটিনের বয়স না বাড়ার রহস্যটা ওর কাছ থেকেই জেনে নিতাম!

অস্মিতা রায়
সপ্তম শ্রেণি
কালিয়াগঞ্জ মিলনময়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়,
উত্তর দিনাজপুর

এবারের প্রতিযোগিতা

সামনেই ইংরেজি নতুন বছর। অনেক স্বপ্ন, অনেক আশায় ভরা। এই নববর্ষকে তুমি কেমনভাবে চাও? এঁকে পাঠাও তোমার কল্পনায় দেখা সেই 'নতুন বছরের ছবি'। ক্লাস ফোর থেকে এইটে যারা পড়ো, তারাই শুধু ছবিটি এঁকে পাঠাবে, ২০ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে। স্কুলের প্রধানকে দিয়ে ছবিটি প্রত্যায়িত করিয়ে নিও। সেরা কয়েকটা ছবি আমরা জানুয়ারি সংখ্যায় ছাপব। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম আর ক্লাস জানিও বাংলা আর ইংরেজিতে।

ঠিকানা:
পাঠকের পাতা
আনন্দমেলা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০১

কমিক্স কমিক্স কমিক্স কমিক্স

টিনটিন | অ্যার্জে

আমেরিকায় টিনটিন ৭৫.০০
আশ্চর্য উল্কা ৭৫.০০
ওটোকারের রাজদণ্ড ৭৫.০০
ক্যালকুলাসের কাণ্ড ৭৫.০০
কাঁকড়া রহস্য ৭৫.০০
কানভাঙা মূর্তি ৭৫.০০
কালো সোনার দেশে ৭৫.০০
কৃষ্ণদ্বীপের রহস্য ৭৫.০০
চন্দ্রলোকে অভিযান ৭৫.০০
চাঁদে টিনটিন ৭৫.০০
তিব্বতে টিনটিন ৭৫.০০
নীলকমল ৭৫.০০
পান্না কোথায় ৭৫.০০
ফারাওয়ের চুরুট ৭৫.০০
ফ্লাইট ৭১৪ | ৭৫.০০
বিপ্লবীদের দঙ্গলে ৭৫.০০
বোম্বেটে জাহাজ ৭৫.০০
মমির অভিশাপ ৭৫.০০
লাল বোম্বেটের গুপ্তধন ৭৫.০০
লোহিত সাগরের হাঙর ৭৫.০০
সূর্যদেবের বন্দি ৭৫.০০
সোভিয়েত দেশে টিনটিন ১০০.০০
হাঙর হ্রদের বিভীষিকা ৭৫.০০

জো জেট জোকো | অ্যার্জে

কারামাকোর অগ্ন্যুৎপাত ৬০.০০
গন্তব্য নিউ ইয়র্ক ৬০.০০
গোখরো উপত্যকা ৬০.০০
জন পাম্পের উত্তরাধিকার ৬০.০০
ম্যানিটোবা জাহাজের রহস্য ৬০.০০

অ্যাডভেঞ্চার কমিকস্

৪০.০০
কাহিনি ও ছবি : **ময়ূখ চৌধুরী**

প্রোফেসর শঙ্কুর রোমাঞ্চকর কমিকস্

কাহিনি : **সত্যজিৎ রায়** ছবি : অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

• একশৃঙ্গ অভিযান ৭০.০০ • প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ এফ ও ৬০.০০ • প্রোফেসর শঙ্কু—চী-চিং • আশ্চর্য পুতুল ৬০.০০ • প্রোফেসর শঙ্কু-রোবু • হাড় ৭০.০০ • মরুরহস্য • শঙ্কু ও আদিম মানুষ ৫০.০০ • মানরো দ্বীপ • আশ্চর্জন্তু ৭৫.০০ • শঙ্কুর কঙ্গো অভিযান ৪০.০০

পটলডাঙার টেনিদা-কমিক্স

কাহিনি : **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়**
ছবি : অরিজিৎ দত্তচৌধুরী
ঝাউ-বাংলোর রহস্য ৬০.০০
টেনিদা আর সিন্ধুঘোটক-ইয়েতি ৭৫.০০

অ্যাসটেরিক্স

গল্প:গোসিনি | ছবি: ইউদেরজো

অ্যাসটেরিক্স ও ক্লিওপেট্রা ৬০.০০
অ্যাসটেরিক্স ও গথ দস্যু ৬০.০০
অ্যাসটেরিক্স ও নর্ম্যান দল ৬০.০০
অ্যাসটেরিক্স ও সোনার কাস্তে ৬০.০০
গলদেশ পরিক্রমায় অ্যাসটেরিক্স ৬০.০০
গলযোদ্ধা অ্যাসটেরিক্স ৬০.০০
গ্ল্যাডিয়েটর অ্যাসটেরিক্স ৬০.০০
দুই প্রধানে ধুন্ধুমার ৬০.০০
ব্রিটেনে অ্যাসটেরিক্স ৬০.০০
রোমান সৈনিক ৬০.০০

সন্তু-কাকাবাবুর অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

কাহিনি : **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়**
চিত্রনাট্য ও ছবি: বিজন কর্মকার
ভয়ংকর সুন্দর ৬০.০০

গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার

কাহিনি : **সত্যজিৎ রায়** ছবি : অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়
গ্যাংটকে গণ্ডগোল ১০০.০০
নেপোলিয়নের চিঠি ৭৫.০০
এবার কাণ্ড কেদারনাথে ৭৫.০০

নীল ও জগাদার অ্যাডভেঞ্চার

কাহিনি ও ছবি : **কৌশিক কুণ্ডু**
গোখরো দ্বীপের ডাকিনী ৬০.০০

দক্ষিণ কলকাতায় আনন্দ-র বই
১৯০/২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৯
ফোন: ২৪৬৪-৬২১২
এখানে পাবেন আনন্দ-প্রকাশিত সমস্ত বই।
নিজের হাতে দেখে পছন্দ করে বই কেনার সুযোগ।
রবিবারেও খোলা থাকছে।

আনন্দ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন: ২২৪১ ৪৩৫২, ২২৪১ ৩৪১৭, ই-মেল: ananda@cal3.vsnl.net.in ওয়েবসাইট : www.anandapub.com

শব্দহীন উড়োজাহাজ

'নৈঃশব্দ্যের আওয়াজ' শুনবে পৃথিবীর মানুষ! দৈত্যাকার প্লেন উড়ে যাবে মাথার উপর দিয়ে, কিন্তু কোনও আওয়াজ হবে না। নীচে মানুষজন জানতেই পারবে না। ভয়ানক শব্দে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাবে না কেউ। এ এমন এক প্লেন, যা উড়ে চলবে প্রায় শব্দহীনভাবে। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের প্রোফেসর অ্যান ডাউলিং এবং ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির (এম আই টি) প্রোফেসর এড গ্রিটজ়ার-এর নেতৃত্বে 'সাইলেন্ট এয়ারক্র্যাফ্‌ট ইনিশিয়েটিভ' প্রোজেক্টের বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই ডিজ়াইন করে ফেলেছেন এই প্লেনের (পাশের ছবিতে)। চল্লিশ জন বিশেষজ্ঞ রয়েছেন এই প্রোজেক্টে। শুধু শব্দহীনতাই নয়, অন্যান্য প্লেনের চেয়ে ২৫ শতাংশ জ্বালানি খরচও কমাবে নতুন প্রযুক্তির এই আকাশযান। অবশ্য বাণিজ্যিকভাবে এটি বাজারে আসতে এখনও দেরি আছে।

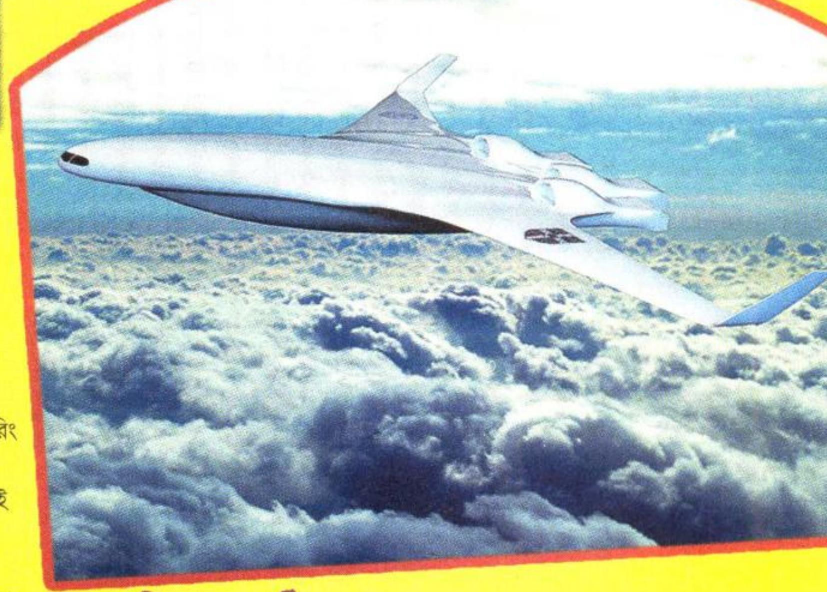

বুদ্ধিমান লাঠি!

সাদামাঠা লাঠি একটা, ওয়াকিং স্টিক আরকী। বৃদ্ধ মানুষের হাঁটাচলার সঙ্গী। দরকারে এই লাঠিই ডেকে দেবে অ্যাম্বুলেন্স! জার্মানির কাইজ়ারলোটার্ন-এর ফ্রাউনহোপার ইনস্টিটিউট ফর এক্সপেরিমেন্টাল সফ্‌টওয়ার ডেভেলপমেন্ট-এর বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন এরকমই এক 'বুদ্ধিমান' লাঠি। কেউ যদি এই লাঠি নিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে পড়ে যান, তৎক্ষণাৎ অ্যাম্বুলেন্সে বা তাঁর কোনও আত্মীয়কে খবর পাঠিয়ে দেবে এই লাঠি। এতে রয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির একটি সেন্সর। লাঠি হাতে কেউ মাটিতে পড়ে গেলে, ওই সেন্সর তা জানাবে একটি কন্ট্রোল ইউনিটকে। বিশেষ ধরনের প্রোগ্রামিং করা এই কন্ট্রোল ইউনিট সঙ্গে-সঙ্গে খবর পাঠিয়ে দেবে অ্যাম্বুলেন্সে বা কোনও আত্মীয়র বাড়িতে।

তারার রাজ্যে আনাউশে আনসারি

কাজাখস্তানের বৈকানুর মহাকাশকেন্দ্রে ১৭ সেপ্টেম্বর আনাউশে আনসারির জীবনের এক বিশেষ দিন। কারণ, ওই দিনটিতেই স্বপ্নপূরণ হয়েছিল তাঁর। তারার রাজ্যে হারিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আনাউশের ছেলেবেলা থেকেই। সেই ইচ্ছে বাস্তবে রূপ পেল, রুশ মহাকাশযান সয়ুজ টি এম এ-নাইন-এ করে আকাশে উড়লেন তিনি। ডেনিস টিটো, মার্ক শাটলওয়ার্থ এবং গ্রেগ ওলসেন-এর পর এবার ইরানি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক আনাউশে আনসারি। স্পেস টুরিজ়ম শুরু হওয়ার পর আনাউশের আগে এঁরা তিনজনেই নিরাপদে ঘুরে এসেছেন মহাকাশে। আনাউশে প্রথম মহিলা, যিনি এই মহাকাশ ভ্রমণের সুযোগ পেলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও দু'জন মহাকাশচারী। প্রথমে ঠিক ছিল জাপানের ব্যবসায়ী দেইসুক এনোমোটো উড়বেন আকাশে। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় এই বিরল সুযোগ পেয়ে গেলেন আনাউশে। আমেরিকায় প্রোডিয়া সিস্টেমস নামে এক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার মালিক আনাউশে। মহাকাশে, ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে তিনি ছিলেন আট দিন। সেখানে অ্যানিমিয়া, পিঠের ব্যথা, স্পেস স্টেশনে বিভিন্ন প্রজাতির মাইক্রোবের উপস্থিতি, স্পেস স্টেশনের ক্রু মেম্বারদের শরীরে স্পেস রেডিয়েশনের প্রভাব ইত্যাদির মতো বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন। ২৯ সেপ্টেম্বর নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন তিনি।

টেলিপোর্টেশনের ম্যাজিক

সায়েন্স ফিকশন টিভি সিরিয়াল 'স্টার ট্রেক'-এর কথা মনে পড়ে? ডাঃ এমোরি এরিকসন-এর আবিষ্কৃত টেলিপোর্টেশন মেশিন-এর সাহায্যে যে-কোনও মানুষকে এনার্জিতে রূপান্তরিত করে, চোখের পলকে অনেক দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া যেত! সেখানে পৌঁছে এনার্জি থেকে আবার বস্তুতে রূপান্তরিত হত সে! মানে এনার্জি থেকে আবার তাকে মানুষে রূপান্তরিত করা হত আরকী। কিন্তু সে তো নেহাতই সায়েন্স ফিকশন। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সাহায্যে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, টেলিপোর্টেশন করা সত্যিই সম্ভব। এই আশ্চর্য কাণ্ড ঘটিয়েছেন ডেনমার্কের কোপেনহেগেন-এর নিল্‌স বোর ইনস্টিটিউট-এর পদার্থবিদ ইউজিন পোলজ়িক আর তাঁর দলের বিজ্ঞানীরা। ব্যাপারটা এরকম— কোনও একটা জায়গায় একটা পদার্থের উপাদানকে ভেঙে ফেললেন তাঁরা। দূরে (সেই দূরত্বটা খুবই কম), অন্য একটা জায়গায় জুড়ে গেল সেই ভেঙে ফেলা উপাদানগুলো। যদিও বাস্তবে টেলিপোর্টেশনের এখনও শৈশবাবস্থা, বিজ্ঞানীদের আশা, ভবিষ্যতে এর সাহায্যে অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হবে। তথ্যপ্রযুক্তির জগতে এক বৈপ্লবিক যুগের সূচনা করবে টেলিপোর্টেশন। কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশন প্রযুক্তির কম্পিউটার লক্ষ-কোটি গুণ পিছনে ফেলে দেবে পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগতির কম্পিউটারকেও।

জয় সেনগুপ্ত

গোবর্ধন প্লাস হারাধন

গৌতম দাশগুপ্ত

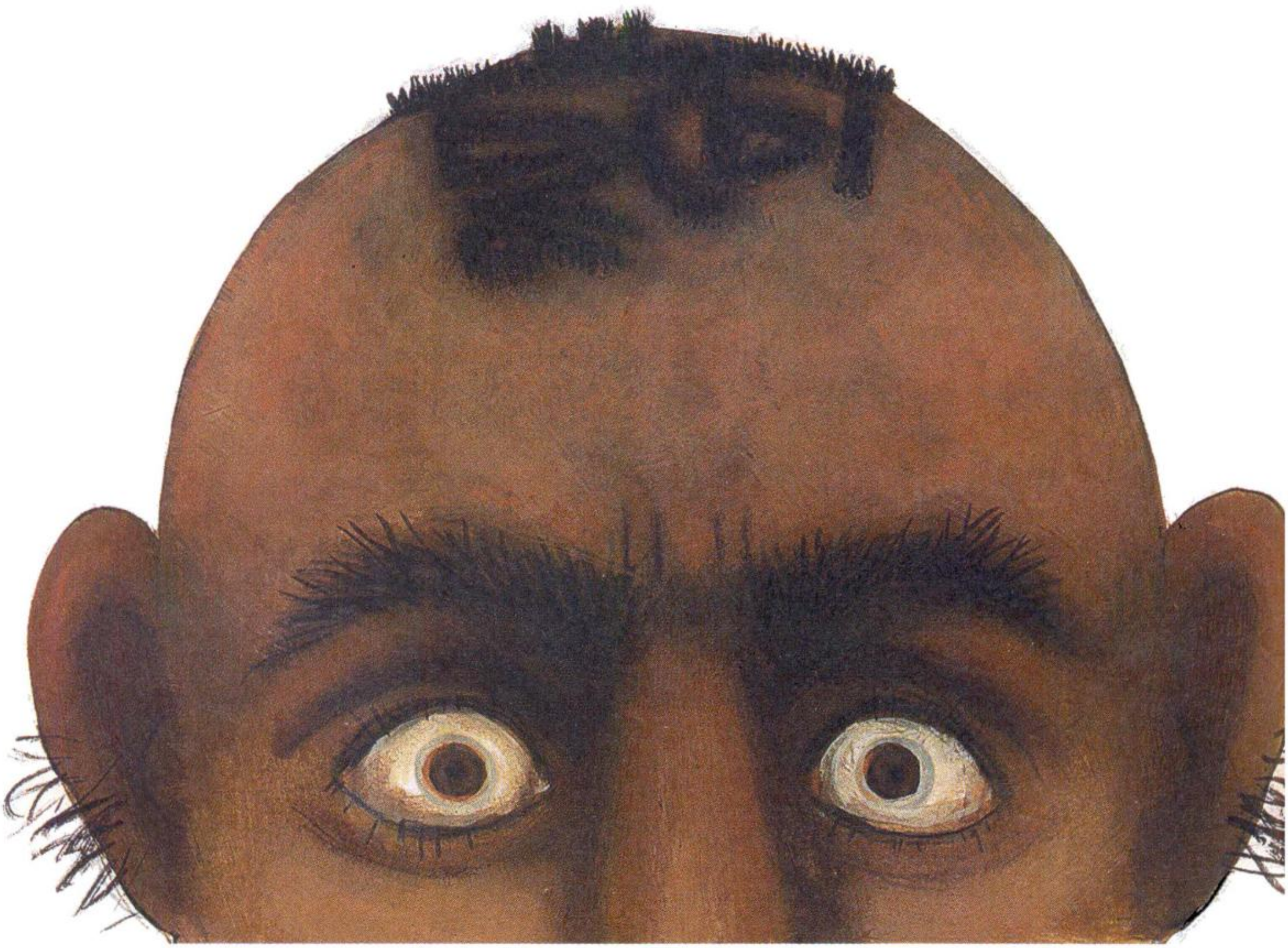

সন্ধের সময় দু'টো চোরকে ধরে এনে গারদে পুরে দিয়ে গলদঘর্ম গোবর্ধনবাবু নিজের চেয়ারে বসলেন। সকাল থেকে প্রচুর ধকল গিয়েছে। লকআপে গোটা পঁচিশেক দুষ্কৃতীকে ভরা হয়েছে আজ। দু'জন বাছাই করা কনস্টেবল আছে, পাঁড়ে আর দুবে। রাতে লকআপের অতিথিদের দেখভাল করার দায়িত্ব ওদের দু'জনের। কিছু লেখালিখির কাজ সেরে উঠে পড়লেন। আগামী কাল জামাইষষ্ঠী, শ্বশুরবাড়ি যাবেন। মেজোবাবুকে কিছু জরুরি নির্দেশ দিয়ে সোজা কোয়ার্টারে চলে এলেন। কোয়ার্টারে তিনি একাই থাকেন। পরিবারের অন্যরা থাকেন কলকাতায়। শ্বশুরবাড়িও অবশ্য কলকাতাতেই। তবে দু' বাড়ির মধ্যে প্রায় দেড় ঘণ্টার দূরত্ব। ঠিক হয়ে আছে, গোবর্ধনবাবু সোজা শ্বশুরবাড়িতেই যাবেন। স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে সব আগেই সেখানে পৌঁছে যাবেন।

গোবর্ধনবাবু বাটপাড়গঞ্জ থানার বড়বাবু। আগে বাটপাড়গঞ্জে চোর-ডাকাত-খুনে-গুন্ডারাই ছড়ি ঘোরাত। বছরে ডজন পাঁচেক খুন, গোটা পঞ্চাশ ডাকাতি, আর শ'পাঁচেক চুরির ঘটনা ছিল জলভাত। গোবর্ধন গুঁই বড়বাবু হয়ে আসার মাস তিনেকের মধ্যে দেখা গেল পকেটমার পঙ্কা, চোর চিকু, সাট্টাবাজ শান্টু, খুনে খেটকু, এমনকী ডঙ্কা, বলাই, পিলু, ছিটকিনি, ডুগডুগি, এদের মতো দিকপাল ডাকাতরাও শুধরে গিয়েছে। কেউ ধামা-কুলো বোনার কাজে, কেউ

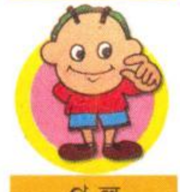

রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজে, কেউ বা বাঁধের মাটি কাটার কাজে লেগে গেল। কয়েকজন আবার মিষ্টির দোকান আর খাবার হোটেলও খুলে বসল। এমনকী সিধু সিঁধেল পর্যন্ত সিঁধকাঠি ফেলে দিয়ে নদীর মাটি তুলে ঠেলাগাড়িতে ফেরি করতে লাগল, "এঁটেল মাটি লেবে গো-ও-ও।"

তবে এরাই তো সব নয়। কিছু পাজি লোক চুপচাপ এলাকা ছাড়ল। নয়তো স্রেফ গা-ঢাকা দিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় রইল। তাই গোবর্ধনবাবুর এখনও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার সময় আসেনি।

কোয়ার্টারে এসে স্নান সেরে তরতাজা হয়ে বসতে না-বসতে উলটো দিকের হোটেল থেকে রাতের খাবার এসে গেল। গরম রুটি-তরকা, একটা সব্জি আর আচার। এখানে এসে প্রথম থেকেই হোটেলটার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নিয়েছেন। খাওয়া সেরে বিছানায় গেলেন। শোওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকালে জেগে উঠতেই মনে পড়ল আজ জামাইষষ্ঠী। মনটা বেশ ফুরফুরে হয়ে উঠল। কিন্তু এই সুখ বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। বাথরুমে গিয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। তাঁর মাথার ডান পাশ আর গোঁফের বাঁ পাশ সম্পূর্ণ কামানো। একদম তেলতেলে পরিপাটি, যেন কখনও ওখানে চুল ছিলই না। একটু আগের নেচে ওঠা মনময়ূরের পেখম যেন নেতিয়ে পড়ল। খুব ভালভাবে বুঝে গেলেন যে, এবারকার মতো জামাইষষ্ঠীর কথা ভুলে যেতে হবে। কারণ, পুরো মাথা-মুখ কামিয়ে ফেলা ছাড়া অন্য উপায় নেই। আর ন্যাড়া মাথায় শ্বশুরবাড়ি? ছোঃ! বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিলেন, এবার জামাইষষ্ঠী অ্যাটেন্ড করা হচ্ছে না।

সেলুনে যাওয়ার জন্য বেরোতে গিয়েও থমকে গেলেন। এরকম মাথা নিয়ে সেলুনে যাওয়া ঠিক হবে না। সেলুনের লোক ভাববে তিনি নিজে মাথা কামাতে গিয়েছিলেন। পুরো কামাতে না পেরে শেষে সেলুনে এসেছেন বাধ্য হয়ে। ব্যাপারটা চাউর হতেও সময় লাগবে না। সে ভারী বেইজ্জতির কথা, বিশেষ করে তাঁর মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ মানুষের কাছে। অগত্যা সেফ্‌টি রেজ়ারে নতুন ব্লেড লাগিয়ে নিজেই কাজ শুরু করলেন।

ঘণ্টাখানেকের অধ্যবসায়ে তিনখানা ব্লেড খরচ করে নিজের কাজ সম্পূর্ণ করলেন। মাথায় রক্তারক্তি অবস্থা। আয়নায় নিজেকে দেখতে-দেখতে ওই দুঃখজনক অবস্থাতেও তাঁর সদ্য ন্যাড়া মাথায় একটা নতুন আইডিয়া খেলে গেল। ভাবলেন, এবার থেকে লকআপের অতিথিদের এভাবে নিজে-নিজে ন্যাড়া হতে দিলে কেমন হয়! রেজ়ার-ব্লেড-সাবান-জল সব ধরিয়ে দিয়ে আয়নার সামনে বসিয়ে দেওয়া হবে। প্রতিটি বদমাশকে স্বহস্তে নিজের মাথা ক্বামাতে হবে। কামানোর পরে আয়নার দিকে বেকুবমার্কা মুখ করে ওরা যখন তাকাবে, ওহ! দেখার মতো দৃশ্য হবে। নিজের ন্যাড়া মাথার দিকে তাকিয়ে প্রথমে গোবর্ধনবাবুর দু' চোখ জলে ভরে উঠেছিল। এখন একটু বৈরাগ্য-বৈরাগ্য লাগছে। চোর-ছ্যাঁচোড়গুলোরও যদি এমনটাই হয়, তা হলে খুব সহজেই দোষ কবুল করে ফেলবে। চোরাই জিনিসের হদিশও তাড়াতাড়ি বলে দেবে।

সত্যিই দুর্দান্ত আবিষ্কার। মনে-মনে নিজের পিঠ চাপড়ে নিলেন। মাথায় ফটকিরি ঘষে স্নান সেরে এসে চা খেতে-খেতে প্রশ্নটা এল, মাথা আর গোঁফের এ দশা হল কী করে? আরশোলায় চাটলে সে জায়গা একেবারে টাক হয়ে যায়, জানা ছিল। কিন্তু মাথার মাঝখান থেকে শুরু করে পুরো ডান দিকটা রাতারাতি একেবারে কেশহীন করে ফেলতে কয়েকশো আরশোলার দরকার। অত আরশোলা এ বাড়িতে আছে কি? থাকলেও ওদের সেভাবে একত্রিত হতে কখনও দেখেননি। তা হলে! ভেবে কূল-কিনারা পেলেন না কিছু। থম মেরে বসে রইলেন। দুপুরে হোটেল থেকে খাবার দিতে এল। ভিজে তোয়ালে দিয়ে মাথা ভাল করে ঢেকে খাবার নেওয়ার জন্য দরজা খুললেন। সেদিন আর থানায় গেলেন না। রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেন।

সকালে ঘুম ভাঙার পরও অনেকক্ষণ মনমরা হয়ে বিছানায় পড়ে রইলেন। এক সময় উঠে বাথরুমে ঢুকলেন। ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে আবার চমকে উঠলেন। মাথার সামনের দিকে চুল গজিয়েছে যেন! চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে ভাল করে তাকালেন, হ্যাঁ! প্রায় আধ ইঞ্চি মতো চুল গজিয়েছে। কিন্তু এক রাতের মধ্যে এটা কী করে সম্ভব হল? শুধু গজানোই নয়, চুলটা যেন একটা ডিজাইনের মতো দেখাচ্ছে। আয়নায় উলটো দেখাচ্ছে। আর-একটা ছোট হাতআয়না এনে দু'টো আয়নার সাহায্যে দেখলেন। দেখে হাঁ হয়ে গেলেন। চুলটা এমনভাবে গজিয়েছে যেন নিপুণ হাতে লেখা 'ছুঁচো'। পায়ের রক্ত সোজা মাথায় উঠে এল গোবর্ধনবাবুর। এটা আরশোলার কাজ হতে পারে না। নিশ্চয়ই কোনও পাজির পাঝাড়া তাঁর এই কোয়ার্টারে লুকিয়ে আছে। উন্মত্তের মতো এঘর ওঘর খুঁজতে শুরু করলেন। খাটের তলা, আলমারির ভিতর, ট্রাঙ্ক-সুটকেস পর্যন্ত ঘেঁটে শেষে নিজের নস্যির কৌটোর দিকেও সন্দেহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। সব জায়গায় খুঁজেও পাজি লোক তো দূর, একটা গোবেচারা পোড়া বিড়ির টুকরোও পেলেন না। অবশেষে রেজ়ার দিয়ে 'ছুঁচো' লেখাটা বিলুপ্ত করলেন। মেজাজটা অবশ্য সপ্তমে চড়েই রইল।

অনেকক্ষণ পর মাথা যখন একটু ঠান্ডা হয়েছে, মনে পড়ল, এবার ভোটের সময় দেওয়াল লিখন নিষিদ্ধ হয়েছিল। তাই নিজের-নিজের দলের প্রতীকের আদলে চুল ছেঁটে সমর্থকরা প্রচার-মিছিলে নেমেছিল। ওরা নিশ্চয়ই কোনও ভাল সেলুন থেকে মাথার ওই প্রতীকগুলো বানিয়েছিল। গোবর্ধনবাবুর মাথার শিল্পকর্মটিও অবশ্যই কোনও সেলুনের লোকের কাজ। কিন্তু সেরকম কারও সঙ্গে তাঁর শত্রুতা আছে কি না মনে পড়ছে না। আর থাকলেও, সেই শত্রু এত সাহস করত না নিশ্চয়ই। এসব সাতপাঁচ ভাবতে-ভাবতেই দুপুরের খাওয়া সারলেন। তারপর কখন ভাতঘুমে ঢলে পড়েছেন বুঝতে পারেননি। বিকেলে ঘুম ভাঙতেই উঠে আয়নার সামনে গেলেন। যেন আশাই করেছিলেন মাথায় নতুন কিছু দেখবেন। হলও তাই, 'ছুঁচো'র বদলে এবার ঠিক একই জায়গায় '৪২০' লেখা, একেবারে নিখুঁত। এতক্ষণে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন গোবর্ধনবাবু, "কোন হতচ্ছাড়া বদমাশ এসব করছিস? ভালয়-ভালয় সামনে আয়। নইলে..."

তাঁর হুঙ্কারে পাঁচিলের উপর থেকে

একটা বিড়াল ঘুমন্ত অবস্থাতেই পড়ে গেল। আর ঘরের টিউবলাইটের পিছন থেকে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল, যা শুনে গোবর্ধনবাবুর মনে হল, আদালতে জজসাহেব 'অর্ডার-অর্ডার' বলে উঠলেন। একটু থতমত খেয়ে আবার মাথার মেরামতি করলেন রেজার দিয়ে। সকালে আবার কী দেখবেন কে জানে! এদিকে এক প্যাকেট ব্লেড শেষ। তাই সন্ধের পর লোডশেডিং-এর সুযোগে আরও দু' প্যাকেট ব্লেড কিনে এনে রাখলেন।

সকালে কিন্তু নতুন কিছু দেখলেন না। মাথা-মুখ যেমন থাকার কথা, তেমনই। চকচকে কামানো। নিজেকেই বললেন, "শয়তানটা ভয় খেয়ে গিয়েছে। পুলিশের সঙ্গে কত আর মশকরা করবে? ঘাড়ের উপর একটা ছাড়া দু'টো মাথা তো নেই।"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে থানায় যাওয়ার জন্য তৈরি হলেন। থানায় বসে হাল্কা মনেই কাজ করলেন অনেকক্ষণ। সহকর্মীরা তাঁর মাথা আর মুখের দিকে অবাক চোখে তাকালেও কেউ কোনও প্রশ্ন করল না। শুধু মেজোবাবু বললেন, "জামাইষষ্ঠীতে গেলেন না স্যার?"

"ক্যানসেল।" গম্ভীর মুখে বললেন গোবর্ধনবাবু। দুপুরে মেজোবাবুকে বললেন, "পরেশবাবু, এখন আমি বেরোচ্ছি। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরব।"

"ওক্কে স্যার।" মেজোবাবু মাথা তুলে বললেন। তারপর বিস্ময় আর কৌতুক মেশানো দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

"কী হল পরেশবাবু?"

"এ কী স্যার! চৈনিক ছদ্মবেশ নাকি? কোনও রাঘববোয়ালকে পাকড়াও করার প্ল্যান নিশ্চয়ই!"

গোবর্ধনবাবু চমকে উঠে মাথায়-মুখে হাত বোলালেন। মাথায় কিছু না বুঝলেও মুখে চিনেদের মতো দাড়িগোঁফ অনুভব করলেন। জোর করে হেসে মেজোবাবুকে বললেন, "ও হ্যাঁ। এই গেটআপটাই বেস্ট হবে। মানে ওই চেন-লি'টা যা ধুরন্ধর!"

"ঠিক বলেছেন স্যার। তবে প্লেন ড্রেসে যাবেন স্যার। ইউনিফর্ম পরে গেলে সবই মাটি। হে-হে!"

বাইরে এসে গোঁফদাড়ি টেনে দেখলেন, আসল। রাগের চেয়েও মুষড়ে পড়লেন বেশি। কারণ, তিনি জেগে থাকতেই কখন ওসব গজিয়ে গিয়েছে টেরই পাননি। এত তাড়াতাড়ি এসব গজানো কী করে সম্ভব সেটাও তো মাথায় আসছে না। শরীরের কোনও হরমোনের গোলযোগ নয়তো? একবার ভাবলেন ডাক্তারের কাছে যাবেন। পরক্ষণেই ঠিক করলেন, আর ক'টা দিন দেখে তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন। আপাতত এসব কামিয়ে ফেলা ছাড়া আর কী-ই বা করার আছে?

পরদিন সকালে থানায় নিজের চেম্বারে ঢুকতে যাচ্ছেন, ছোটবাবু বোঁচা সরকার হেঁকে উঠলেন, "এই যে গোঁসাইজি। বড়বাবু আসেননি। একটু অপেক্ষা করতে হবে।"

ফিরে দেখলেন, ছোটবাবু তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছেন। বিস্মিত গোবর্ধনবাবু ছোটবাবুর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ছোটবাবু হাসি মুখে চেয়ার দেখিয়ে বললেন, "বসুন গোঁসাইজি। অষ্টপ্রহর সংকীর্তনের পারমিশান চাই তো, বসুন। বড়বাবু এখনই এসে পড়বেন।"

গোবর্ধনবাবু এবার তাঁর পুলিশি কণ্ঠে গর্জন করলেন, "বোঁচা! বলি রসিকতার একটা ইয়ে, মানে লিমিট আছে তো, নাকি!"

ছোটবাবু চোখ সরু করে তাকালেন। তাঁর সামনে এক গোঁসাইজি, মানে এক বোষ্টমঠাকুর দাঁড়িয়ে। পরনে লুঙ্গির মতো করে পরা সাদা ধুতি, গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবি, কাঁধে ঝোলা, গলায় তুলসীর মালা, কপালে আর নাকে রসকলি। চকচকে কামানো মাথায় একটা বিশাল টিকি। টিকির ডগায় একটা বড়সড় সাদা ফুল বাঁধা। কাছাকাছি একটা মঠ আছে। সেখানে এরকম চেহারা আর সাজপোশাকের মানুষ হরদম দেখা যায়।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেষে ছোটবাবুর চোখ দু'টো ঝকঝক করে উঠল। লাফিয়ে উঠে বললেন, "একসেলেন্ট স্যার! একসেলেন্ট ছদ্মবেশ!" তারপর গলা নিচু করে বললেন, "ওই মঠের মধ্যে কোনও দুষ্কর্ম চলছে বুঝি স্যার? তাই ওদেরই বেশে ওখানে ঢুকে ভান্ডা ফুঁড়ে দিতে যাচ্ছেন! অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগলে আমি আছি স্যার। আমাকে ছোটগোঁসাই সাজিয়ে সঙ্গে নিয়ে চলুন, প্লিজ। আমি স্যার দশ মিনিটের ভিতর ন্যাড়া হয়ে আসছি।"

গোবর্ধনবাবু এতক্ষণে নিজের দিকে তাকালেন। নিজের বেশভূষার পরিবর্তনটা বুঝতে পারলেন। তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, তিনি ইউনিফর্ম পরে বেরিয়ে ছিলেন। কখন গোঁসাইজি হয়ে গেলেন, আর কীভাবেই বা! ঢোক গিলে ছোটবাবুকে বললেন, "তুমি থানা সামলাও। মোবাইল অন রাখবে। সময়মতো তোমাকে ডেকে নেব।"

ছোটবাবু অতি উৎসাহে অন মোবাইল অফ করে আবার অন করে রাখলেন।

ফাঁপরে পড়া কাকে বলে জীবনে প্রথম টের পাচ্ছিলেন গোবর্ধনবাবু। প্রথমে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কোনও ধড়িবাজ শয়তান, যাকে তিনি জেলে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে রসিকতা করছে। তাঁর গভীর ঘুমের সময় এসে চুলদাড়ি নিয়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে প্রতিশোধ নিচ্ছে। কিন্তু ন্যাড়া মাথায় রাতারাতি 'ছুঁচো' বা '৪২০' ছাঁচে চুল গজানো, মুখে চাইনিজ দাড়িগোঁফ গজানো কী করে সম্ভব? পুলিশ ইউনিফর্মই বা কোন উপায়ে গোঁসাইজির ধুতি-পাঞ্জাবিতে রূপান্তরিত হল? আর ওই বিশাল টিকি!

॥ ২ ॥

হন্তদন্ত হয়ে চলছিলেন গোবর্ধনবাবু। এক সময় টের পেলেন, তাঁর পিছন-পিছন জনতা আসছে। ছোটরা হি-হি হাসছে। দু' পাশে বাড়ির জানলা-দরজা-ছাদ-বারান্দা আর ব্যালকনিতে লোক জমে গিয়েছে। সকলের দৃষ্টি তাঁরই দিকে। এবার নিজের দিকে তাকালেন, আয়না ছাড়া মুখ দেখা যায় না। কিন্তু হাত-পা আর শরীর দেখে বুঝলেন, তিনি একটি গোদা হনুমানে পরিণত হয়েছেন। কোমরে একটা সবুজ জাঙিয়া, তার উপর বেল্টে বাঁধা রিভলভার। গোবর্ধনবাবু লোকজনকে দাঁত খিঁচিয়ে বলতে গেলেন, "ভাগো। সব নিজের-নিজের চরকায় তেল দাও গে যাও।" কিন্তু গলা দিয়ে একটা 'হুপ-হাপ-খিচ-খিচির-খিচ' জাতীয় আওয়াজ বেরিয়ে এল। জনতার মধ্যে হাসির হররা উঠল।

রেগেমেগে গোবর্ধনবাবু রিভলভার টেনে নিতে গেলেন। রিভলভারের খাপ থেকে একটা বড়সড় কলা বেরিয়ে এল। খোসা ছাড়িয়ে কপ-কপ করে কলাটা

খেয়ে নিয়ে খোসাটা পিছনে ছুড়ে ফেললেন। সঙ্গে-সঙ্গে পিছন থেকে 'আইর বাপ' বলে কেউ চিৎকার করে উঠল। খোসাটায় পা হড়কে কেউ আছাড় খেয়েছে। পিছন ফিরে দেখেন, কনস্টেবল পাঁড়ে কোমরে হাত দিয়ে "মর গিয়া রে, একদম মর গিয়া" বলতে-বলতে উঠে বসেছে। হনু-গোবর্ধনবাবু খ্যাঁচ-খ্যাঁচ করে হেসে উঠলেন। হাসতে-হাসতেই উঠে বসে চোখ মেললেন। গোটা ব্যাপারটা যে স্বপ্ন ছিল, তা বুঝে উঠতে আরও কয়েক মিনিট সময় লাগল। বাস্তবে ফিরে একটা বিকট চিৎকার করে উঠলেন, হতাশার বহিঃপ্রকাশ আরকী। নিজের মাথার চুল মুঠো করে ধরতে গিয়েও বিফল হলেন, মাথা তো তেলতেলে, কামানো। বসে ঝিমোলেন অনেকক্ষণ। তারপর সামান্য ধাতস্থ হয়ে কাগজ-কলম টেনে নিয়ে একটা ছুটির দরখাস্ত আর একখানা ইস্তফাপত্র লিখে ফেললেন। ছুটি মঞ্জুর না হলে ইস্তফাই দিয়ে দেবেন। অবশেষে ধড়াচূড়ো পরে সদরে পুলিশ সুপারের দপ্তরে গিয়ে হাজির হলেন।

সুপার টেবিলে মাথা ঝুঁকিয়ে কিছু একটা পড়ছিলেন। গোবর্ধনবাবু দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, "মে আই গেট ইন স্যার?"

সুপার মুখ না তুলেই বললেন, "ইয়েস, কাম ইন।"

গোবর্ধনবাবু টেবিলের সামনে গিয়ে সশব্দে স্যালুট করে দাঁড়ালেন। সুপার মুখ তুললেন। কিন্তু সুপারের চাউনি দেখে গোবর্ধনবাবু আবার নার্ভাস হয়ে পড়লেন। সুপার তাঁকে এভাবে দেখছেন কেন! গোবর্ধনবাবু নিজের দিকে নজর দেওয়ার আগেই সুপার বললেন, "আরে, মিঃ গুঁই যে! আপনাকে তো আমি চিনতেই পারিনি মশাই। তা ব্যাপারখানা কী? কোনও ব্যান্ডপার্টিতে যোগ দিয়েছেন নাকি?"

রাশভারী পুলিশসুপারকে এভাবে বলতে দেখে গোবর্ধনবাবু বেশ হকচকিয়ে গেলেন। তারপর মাথা নামিয়ে নিজেকে দেখলেন। সাড়ে সর্বনাশ! তাঁর পরনে লাল-নীল-হলদে-কালোয় মেশানো ব্যান্ডপার্টির ঝলমলে পোশাক। জামার হাতায় লালের উপর সোনালি হরফে লেখা 'চোংদার ব্যান্ডপার্টি'। আরও তাজ্জব হয়ে দেখলেন, তাঁর বাঁ হাতে একজোড়া ঝুনঝুনিও আছে, ব্যান্ডপার্টির ঝমর-ঝমর বাজনা। অদৃশ্য এবং অজানা দুশমন তাঁকে আবার বোকা বানিয়েছে। থতমত খেয়ে বললেন, "ইয়ে, হ্যাঁ স্যার। ভাবছি এখন থেকে এসব নিয়েই থাকব। এ-এই নিন আমার রেজিগনেশান লেটার।" সোজাসুজি ইস্তফাপত্রটাই বের করে দিলেন।

সুপার বললেন, "মিঃ গুঁই, আমি জানি আপনার কাজের চাপ অত্যন্ত বেশি। অবসাদ আসতেই পারে। তবে আপনার মতো একজন অফিসারকে আমরা হারাতে চাই না। আপনি বরং কিছুদিন ছুটি কাটান। ঝুনঝুনি বাজিয়ে মনটা হাল্কা হলে আবার এসে কাজে যোগ দেবেন। ঠিক আছে!"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।" সুপারের ঘর থেকে বেরিয়ে ঝুনঝুনি দু'টো ডাস্টবিনে ফেলে দিলেন। পোশাক বদলের জন্য আবার কোয়ার্টারে ফেরার কথা ভাবছিলেন। এমন সময় রাস্তায় একটা ফার্নিচারের দোকানের আয়নায় নিজেকে দেখতে পেলেন। কিন্তু কোথায় ব্যান্ডপার্টির পোশাক! আয়নায় পুলিশ-ইউনিফর্ম পরা গোবর্ধন গুঁই। দিব্যি ফিটফাট। দু' পাশে মাথা নাড়তে-নাড়তে স্টেশনের দিকে পা চালালেন। পথের দু' পাশের দোকানে আর রাস্তায় দাঁড়ানো গাড়ির কাচে নিজেকে দেখতে-দেখতে চললেন।

লোকাল ট্রেনে উঠে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন গোবর্ধনবাবু। ভাবছিলেন, কী করব? ওঝা ডাকব! নাকি পুরোহিতমশাইকে ডেকে স্বস্ত্যয়ন করাব। অথবা নিজেই শবসাধনা শুরু করব!

এক ভদ্রলোক চেপেচুপে একটু জায়গা করে গোবর্ধনবাবুকে ডেকে বসতে বললেন। আনমনা গোবর্ধনবাবু বসতে-বসতে বললেন, "বরং প্ল্যানচেটে কাজ হতে পারে। কী বলেন?"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই নিজের ভুল বুঝতে পারলেন, "সরি, আমি একটু ইয়ে, অন্য কথা ভাবছিলাম।"

প্ল্যানচেটের কথা শুনেই কিনা কে জানে, ভদ্রলোক বাকি পথটা আর কোনও কথা বললেন না। কিছুক্ষণ পরে ট্রেন থামতে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর গন্তব্য এসে গিয়েছে। গোবর্ধনবাবু তখনও চিন্তামগ্ন। ওই ভদ্রলোকটি ট্রেনের দরজায় পৌঁছেছেন, এমন সময় নিজের উরুতে জোরে চাপড় মেরে গোবর্ধনবাবু দাঁত খিঁচিয়ে হেঁকে উঠলেন, "ব্ল্যাক ম্যাজিক! নির্ঘাত কেউ ব্ল্যাক ম্যাজিক করছে। একবার ধরতে পারলে ব্ল্যাক-হোয়াইট সব ভুলিয়ে দেব বদমাশটার।"

পাদানিতে পা বাড়ানো ভদ্রলোক প্ল্যাটফর্মের উপর পড়তে-পড়তে কোনওরকমে সামলে নিয়ে দ্রুত সরে পড়লেন। গোবর্ধনবাবু অবশ্য এসব লক্ষ করলেন না। নিজের ভাবনায় তিনি বিভোর।

অনেকক্ষণ পর এক ঝলক ঠান্ডা ভিজে হাওয়া মুখে এসে লাগতে তাঁর হুঁশ ফিরল। বাইরে খুব জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। অবাক হয়ে দেখলেন, গোটা কামরায় তিনি ছাড়া আর কোনও যাত্রী নেই। কলকাতা আসতে আর কতক্ষণ লাগবে কে জানে! হাতঘড়িতে উঁকি মারলেন। বন্ধ হয়ে আছে, দুত্তোর!

হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা অদ্ভুত চিন্তা এল। যে ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দিয়ে তিনি চলেছেন, তা থেকে সম্ভবত আর নিস্তার পাওয়া যাবে না। দুশমন কে তাই যখন জানেন না। এর মধ্যেই যথেষ্ট লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছেন। এবার বরং আত্মঘাতীই হবেন। কোমর থেকে রিভলভার বের করে কানের পাশে চেপে ধরলেন। স্ত্রী-ছেলে-মেয়েদের মুখগুলো চোখের সামনে একবার ভেসে উঠল। ভাবলেন, ওদের যা হওয়ার হবে। মন শক্ত করে ট্রিগার টানতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কে যেন বলল—

আত্মহত্যা মহাপাপ নরকে গমন।
হারাধন শীল কহে শুনে গুণিজন ॥

চমকে উঠলেন গোবর্ধন। "কে? কে আপনি?"

তাঁর মুখোমুখি আসনে বসে আছে বেশ নিরীহ চেহারার একটা লোক। অমায়িক হাসিমুখ। লোকটা এবার বলল, "অবশ্য 'গুণিজন'-এর বদলে 'গোবর্ধনবাবু'ও বলা যায়। কী বলেন?"

গোবর্ধনবাবু লোকটার দিকে রিভলভার তাক করলেন। লোকটা হেসেই কুটিপাটি।

"আপনি মশাই, ইম্পসিবল। ওটা দিয়ে আমার আর কিস্‌সু করতে পারবেন না।"

"আ-আপনি কে?"

"অধমের নাম হারাধন শীল। নামটা

চেনা লাগছে কি?"

"হারাধন, হারাধন। ন্-নাহ। ঠিক মনে পড়ছে না তো!"

লোকটা অভিমানী গলায় বলল, "আপনার আর দোষ কী স্যার! বারো ঘণ্টা পরে নাকি নিজের স্ত্রী-পুত্রই ভুলে যায়। তা 'সিজার ফাইট' বললে বোধ হয় চিনতে সুবিধে হবে।" লোকটার মুখের ভাবে এবার মজা মাখানো।

লাফিয়ে উঠতে গিয়ে উপরের বার্থে গোবর্ধনবাবুর মাথা ঠুকে গেল। বলে উঠলেন, "উ-হু-হু-হু-ওফ। ভ্-ভু-ভু-ভু...।"

"কী হল স্যার, আপনি কী গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে চাইছেন? ওঁ ভূর্ভুব স্বাহা? আহা-হা। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনি নিশ্চিন্তে আরাম করে বসুন। স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে চেষ্টা করুন।"

॥ ৩ ॥

গোবর্ধনবাবুর সব মনে পড়ে গিয়েছে। বাটপাড়গঞ্জের বাজারে হারাধন শীলের বিখ্যাত সেলুন 'সিজার ফাইট'। সাইনবোর্ডে একটা বিশাল কাঁচির ছবিও আছে। হারাধনের বাড়ি সেলুনের লাগোয়া। হারাধন আর তার ছেলে কৃষ্ণধন একই ঘরে ঘুমোত। জামাইষষ্ঠীর আগের দিন সকালে কৃষ্ণধন জেগে উঠে দ্যাখে, ছাদের পাখার সঙ্গে দড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে আছে হারাধন। খবর পেয়ে গোবর্ধন সেখানে গেলেন। গিয়ে যখন শুনলেন যে, বাপ-ছেলে একই ঘরে ঘুমোচ্ছিল, তখন কৃষ্ণধনকেই তুলে এনে লকআপে ভরে দেন। ছেলেটার কোনও দোষ ছিল না, সেটা তিনি প্রথমেই হারাধনের সুইসাইড নোট পড়ে বুঝতে পেরেছিলেন। চিঠিটা ছিল এরকম:

আমি সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করছি। ওই শোচনীয় পরাজয়ের পর আমার আর বেঁচে থাকার কোনও অর্থই হয় না। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমার এই স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও যদি কোনও মাথামোটা পুলিশ আমার স্ত্রী বা পুত্রকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করে, তা হলে আমার অতৃপ্ত আত্মা ভয়ানক প্রতিশোধ নেবে। ইতি—

হারাধন শীল
সিজার ফাইট সেলুন,
বাটপাড়গঞ্জ বাজার।

সবই ঠিক ছিল। শুধু চিঠির মধ্যে ওই 'মাথামোটা' শব্দটা গোবর্ধনের মাথার আগ্নেয়গিরিকে জাগিয়ে তুলেছিল। ওই একটা মাত্র শব্দের জন্যই হারাধন তাঁর বিরাগভাজন হয়ে পড়েছেন। কিন্তু মৃত হারাধনের উপর আর কী প্রতিশোধ নেবেন! তাই ওর ভালমানুষ ছেলেটাকেই এক রাত লকআপে ভরে রাখলেন।

গোবর্ধনবাবু একটু স্বাভাবিক হয়ে এসেছেন। বুঝতে পারছেন যে, হারাধনের ভূত আর যাই করুক, তাঁকে মেরে ফেলবে না। ঘাড় মটকানোর ইচ্ছে থাকলে অনেক আগেই স্বচ্ছন্দে সেটা করতে পারত। ব্যাগ থেকে বোতল বের করে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেয়ে নিলেন। হারাধন মিচকে-মিচকে হাসছিল। এবার বলল, "আমার ছেলেটাকে খামোখা হাজতবাস করালেন কেন স্যার? আমার সুইসাইড নোটটা কী যথেষ্ট ছিল না?"

"হ্যাঁ। ইয়ে, ঠিক আছে। তবে, ওই মাথামোটা শব্দটা, ওটা ঠিক...।"

হারাধন কয়েক সেকেন্ড গোবর্ধনের মাথার দিকে চেয়ে রইল। সত্যিই মাথাটামোটা কিনা দেখল বোধ হয়। তারপর 'খ্যাক-খি-খি-খি-খি' করে হেসে উঠল।

"ওই শব্দটা আপনার হৃদয়ে বেজেছে বুঝি! শক্তিশেলের মতো? ও-হো-হো-হো-হো।" একটু পরে হাসি থামিয়ে বলল, "দেখুন স্যার, এই হারাধনের তো একটাই মাত্র ছেলে। বিনা দোষে তাকে আপনি অনেক কষ্ট দিয়েছেন। দুবে, মানে আপনার ওই কনস্টেবল, হাজতের মধ্যে ছেলেটাকে খুব মেরেছে। আমি সে সবেরই শোধ তুললাম। ওই দুবেকেও আমি ছাড়িনি। থানায় ফিরে শুনবেন, দুবে পাগল হয়ে গিয়েছে। এক মাস ও পাগল হয়েই থাকবে। তবে আপনার উপর এখন আমার আর কোনও রাগ নেই।"

হারাধনের শেষ বাক্যটা শুনে গোবর্ধনবাবুর ধড়ে যেন প্রাণ ফিরল। গদগদ কণ্ঠে বললেন, "অজস্র ধন্যবাদ হারাধনবাবু। শুধু আর-একটা রিকোয়েস্ট।"

"আদেশ করুন স্যার।"

"ইয়ে, ওই মাথামোটা শব্দটা চিঠি থেকে আউট করে দেওয়া যায় না?"

"আউট?"

"আউট।"

"ঠিক আছে। আউট। থানায় ফাইল খুলে দেখবেন চিঠি থেকে ওই শব্দটা গায়েব।"

"থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ। তা আর-একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে যে..."

"বলে ফেলুন না।"

"আপনার আত্মহত্যার কারণ সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন। অবশ্য চিঠিতে একটা 'শোচনীয় পরাজয়' জাতীয় কিছু লিখেছেন বটে। কিন্তু...।"

হারাধনের মুখটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল, "সেই কম্পিটিশনটার কথা আপনার মনে নেই?"

গোবর্ধনবাবুর কিছু মনে পড়ল না। দু' পাশে মাথা নাড়লেন।

হারাধন ম্লান হেসে বলল, " দ্রুত ন্যাড়াকরণ প্রতিযোগিতা।"

"ও, হ্যাঁ।"

"আমাকে চিটিং করে হারানো হয়েছিল। আর এ ঘটনার পর আমার খদ্দেররাও সব গিয়ে ওই চ্যাম্পিয়ন ভেল্টু প্রামাণিকের সেলুন 'সিজারিয়ান'-এ ভিড় করতে লাগল। আমার খুব দুঃখ হল। ঝুলে পড়লাম সিলিং ফ্যান থেকে।"

"না, না। এটা কিন্তু একটা মস্ত বড় ভুল করেছেন। সামনেরবার তো আপনি ভেল্টুকে হারিয়েও দিতে পারতেন। হাজার হলেও আপনি চার বছরের টানা চ্যাম্পিয়ন। যাকগে। চিটিংয়ের কথা কী যেন বলছিলেন?"

"আর বলবেন না। ফাইনালের দিন আমার উপর যার মুণ্ডনের ভার পড়েছিল, তার চুল সিকি ইঞ্চি বড় ছিল। এটা চিটিং নয়?"

"হুঁ। তা বটে।"

ঘটনাটা এরকম: বাটপাড়গঞ্জে প্রতি বছর চড়ক পুজোর আগের দিন থেকে শুরু হয়, 'দ্রুত ন্যাড়াকরণ প্রতিযোগিতা'। এটা বাটপাড়গঞ্জের একটা অন্যতম ঐতিহ্য ও আকর্ষণ। এখানে উৎসব হিসেবে দুর্গাপুজোর পরেই এর স্থান। অবশ্য প্রথমে এই প্রতিযোগিতার নাম 'দ্রুত মুণ্ডন' রাখার জন্য তুমুল আন্দোলন হয়েছিল। তবে তা ধোপে টেকেনি। বাটপাড়গঞ্জের মোট ষোলোটি নামী সেলুনকে এই প্রতিযোগিতায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। যে যত দ্রুত ন্যাড়া করতে পারে, সে তত ওস্তাদ পরামানিকের সম্মান পায়। চ্যাম্পিয়নকে দেওয়া হয়

'ক্ষুরবীর ট্রোফি'। এখানকার ছেলে-বুড়ো সব হুড়োহুড়ি করে আসেন ন্যাড়া হওয়ার জন্য। এও একটা বিরল সম্মান যে! তবে অনেক বেছেবুছে বেশ ঘন চুলওয়ালা মাথার লোকদের নির্বাচিত করা হয়। চুলের দৈর্ঘ্যও নির্ধারিত করা আছে। সামান্য বেশি দৈর্ঘ্যের চুল হলে তা প্রথমে নিরপেক্ষ লোক দিয়ে ছাঁটিয়ে নেওয়া হয়। তা ছাড়া নিয়মকানুনও বেশ কড়া। কামানোর সময় যদি একটুও কেটে-ছড়ে যায় বা রক্তপাত হয়, অথবা কামানোর পর মাথা পরীক্ষা করে বিচারকমণ্ডলী যদি এক কুচি না কামানো চুলও পান, তা হলে তাঁরা প্রতিযোগীকে বাতিল করে দেন।

পয়লা বৈশাখ হয় ফাইনাল। সেদিন স্থানীয় বিধায়ক ভুবন ভড় আর প্রতিষ্ঠিত মস্তান গাবদা গড়াই ন্যাড়া হয়ে থাকেন। বেশ ক'বছর ধরে এমনটাই চলে আসছে। অবশ্য দুই ফাইনালিস্ট পরামানিকের মধ্যে প্রতিবারই একটা চাপা টেনশন তৈরি হয়। আসলে দু'জনই চায় বিধায়ককে ন্যাড়া করতে। তো এবারও যথারীতি হারাধন আর ভেল্টু ফাইনালে উঠল। হারাধন এবার জিতলে পরপর পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার বিরল কৃতিত্ব অর্জন করবে। অন্য দিকে ভেল্টুও মরিয়া, চার-চারবার ফাইনালে হারের বদলা নিতে চায়। যথাসময়ে টস হল। টসে জিতে ভেল্টু বেছে নিল বিধায়ককে। তার মানে হারাধন গাবদা গড়াইকে ন্যাড়া করবে। এদিকে হারাধন বলল, "গাবদার মাথার চুল বিধায়কের চেয়ে অন্তত সিকি ইঞ্চি লম্বা। ছাঁটিয়ে বিধায়কের চুলের সমান করে নিতে হবে।"

বিচারকমণ্ডলী অবশ্য দু'জনের চুলের দৈর্ঘ্যের পার্থক্য ধরতে পারলেন না। হারাধনের আর্জি নামঞ্জুর হল। শুরু হল ন্যাড়াকরণ। হারাধনের মেজাজ খিঁচড়েই ছিল। কামাতে-কামাতে রাগের মাথায় বেশ জোরে ক্ষুরের এক টান দিল। গাবদা চেঁচিয়ে উঠল। দেখা গেল, গাবদার মাথার চামড়া কেটে রক্ত গড়াচ্ছে। অতএব হারাধন ডিসকোয়ালিফাইড, অর্থাৎ এবার ভেল্টুই হল চ্যাম্পিয়ন।

॥ ৪ ॥

হারাধন চুপচাপ গোবর্ধনবাবুকে লক্ষ করছিল। এবার বলল, "কী ভাবছেন স্যার?"

"ভাবছি, আপনার উপর সত্যিই অবিচার হয়েছে।"

"শুধু কি তাই? পাবলিককেও দেখুন, এত কাল যারা আমার সেলুনে চুল ছাঁটাত, দাড়ি কামাত, আমি হারতেই সব গিয়ে ভিড় জমাল ভেল্টুর দোকানে। অকৃতজ্ঞ!"

"আর-একটা প্রশ্ন। আপনি কেশশিল্পী। আমার চুলদাড়ি নিয়ে কারুকাজ করা আপনার কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। কিন্তু পুলিশ ইউনিফর্মের গোঁসাইজিমার্কা পোশাকে রূপান্তর, আবার কখনও ব্যান্ডপার্টির পোশাক হয়ে যাওয়া, উইথ ঝুনঝুনি, কী করে সম্ভব? তা ছাড়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চিনে দাড়িগোঁফ, অত বড় টিকি!"

হারাধন খি-খি করে হাসল, "আরে মশাই! এটুকু না পারলে জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে আমাদের আর তফাত রইল কোথায়?"

অপ্রতিভ গোবর্ধনবাবু বললেন, "তা বটে।"

হারাধন এবার গম্ভীর, "আপনাকে স্যার, অনেক বিরক্ত করেছি। তার সামান্য ক্ষতিপূরণ দিতে চাই।"

"ক্ষতিপূরণ! কী রকম?"

"গাবদা গড়াই আসলে স্মাগলার, জানেন তো? ওর গোপন আস্তানায় দু'টো সুটকেস ভর্তি সোনার বিস্কুট লুকনো আছে। আমার সঙ্গে চলুন। সোনাটা অর্ধেক আপনি নেবেন, বাকি অর্ধেক কেষ্টকে দেবেন।"

"কেষ্ট?"

"কৃষ্ণধন। আমার ছেলে।"

"ওহ। কিন্তু ওভাবে তো হবে না। সোনার সবটাই সরকারের কাছে জমা দিতে হবে। মোট দামের দশ পার্সেন্ট আমি পুরস্কার হিসেবে পাব। সেটা পুরোটা কেষ্টকে দিতে পারি। চলবে?"

"পুরোটা চাই না। অর্ধেক আপনার।"

"ঠিক আছে। ডান।"

পরের স্টেশনে নেমে উলটোমুখো ট্রেন ধরে আবার বাটপাড়গঞ্জে ফিরলেন। হারাধন পথ দেখিয়ে তাঁকে গাবদার গোপন আস্তানায় নিয়ে গেল। গাবদা তৈরি ছিল না। সহজেই ধরা পড়ল দু' সুটকেস সোনার বিস্কুট সমেত। গোবর্ধনবাবুর সঙ্গে হাতকড়া ছিল না। হারাধন কোথা থেকে যেন দড়ি জোগাড় করল। গাবদাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে সুটকেস দু'টো খুললেন। অত সোনা এক সঙ্গে দেখে গোবর্ধনবাবুর চোখ দু'টো একেবারে ছানাবড়া। গোবর্ধনবাবুর অবস্থা দেখে হারাধন বলল, "কী বুঝলেন স্যার? গোবর্ধন প্লাস হারাধন ইজ ইকোয়াল টু...?"

"গু-গু-গু-গু-গু।"

গোবর্ধনবাবুকে তোতলাতে দেখে হারাধন বলল, "কী হল স্যার?"

"গু-গুপ্তধন!"

"রাইট স্যার। গুপ্তধনও বলা যায় বইকি।"

কিছুক্ষণ পর গোবর্ধনবাবু বীরদর্পে থানায় এসে ঢুকলেন। গাবদাকে লকআপে ঢোকালেন। তারপর মেজোবাবু, ছোটবাবুর অজস্র প্রশ্নের জবাব দিয়ে তাঁদের কৌতূহল মেটালেন। অবশ্য হারাধনের ব্যাপারটা চেপে গেলেন। জানতে পারলেন, দুবে সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছে। এক মাস পরেই ও সেরে যাবে, সেটা কাউকে বললেন না।

ফাইল খুলে হারাধনের সুইসাইড নোটটা দেখলেন। 'মাথামোটা' শব্দটা সত্যিই উধাও। একটু পরে ছোটবাবু এসে অভিমান করে বললেন, "আমাকে সঙ্গে নিলেন না স্যার! বড় আশা করে মোবাইল অন করে বসে ছিলাম।"

গোবর্ধনবাবু দেখলেন, ছোটবাবু মাথা ন্যাড়া করে ফেলেছেন। ছোটগোঁসাই সাজার অভিলাষ। ছোটবাবুর কাঁধ চাপড়ে উৎসাহ দিলেন, "হবে, হবে বোঁচা। অপরাধীর তো আর আকাল পড়েনি?"

এক ফাঁকে হারাধন এসে বলে গেল, "কেষ্টর ভাগটা যেন ভুলে যাবেন না স্যার।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চিন্ত থাকুন।"

ঘণ্টাখানেক পরে থানায় একটা টেলিফোন এল। একজন সার্জন আত্মহত্যা করেছেন। গোবর্ধনবাবু সঙ্গে-সঙ্গে উঠে থানা থেকে বেরিয়ে গেলেন। এবার সদর থেকে এক মাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় নিজের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকবেন। পরামানিকের ভূত যা নাকাল করে ছাড়ল, এর পর সার্জনের ভূতের পাল্লায় পড়লে আর রক্ষা থাকবে না।

ছবি: সুব্রত চৌধুরী

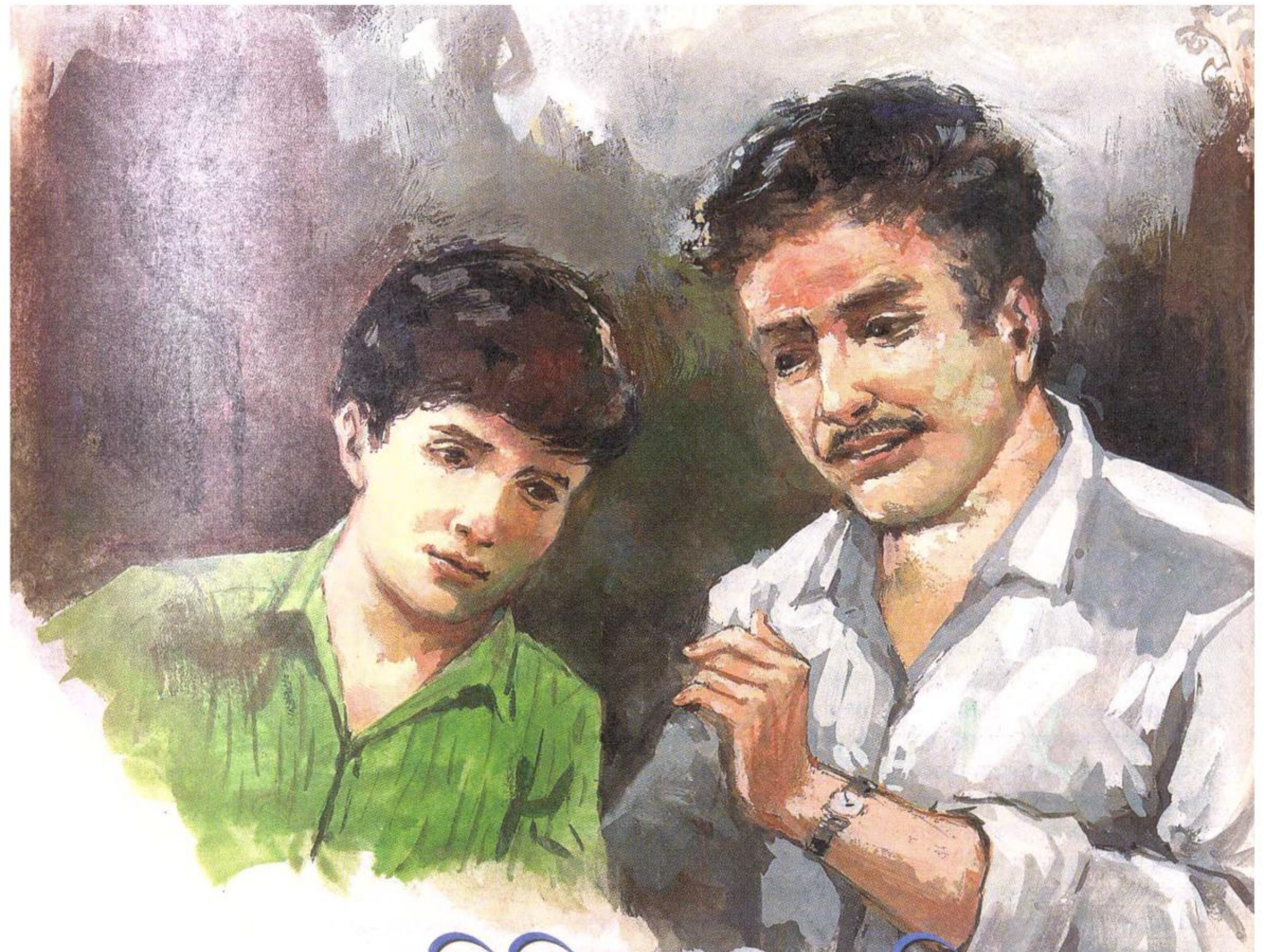

চকদিঘির ভূতপরি

সুব্রত হালদার

আমার বন্ধু শঙ্কররা বেড়াতে গিয়েছিল বর্ধমানের চকদিঘি রাজবাড়ি। ওর কাছে সেখানকার গা-ছমছমে সব গল্প শুনে আমারও খুব ইচ্ছে হচ্ছিল একবার বেড়িয়ে আসি চকদিঘি। গীতালিকে বলেছিলাম সেকথা। গীতালি তার হিসেবি মন নিয়ে বলেছিল, "বন্ধুরা যে যখন বেড়ানোর গল্প বলে, তুমি উতলা হয়ে পড়ো সেখানে যাওয়ার জন্য। সংসার, টাকাপয়সার কথা ভাববার দরকার মনে করো না।"

কথাটা গীতালি অন্যায্য কিছু বলেনি। সত্যিই আমি একটু ওরকমই। কিন্তু ঘর সংসার যখন করেছি, তখন সংসারের কথাও তো ভাবতে হবে। কী আর করা যাবে। তখনকার মতো মনের ইচ্ছে মনের মধ্যে পুষে সংসারে মন দিয়েছিলাম।

গীতালিকে যখন কথাগুলো বলেছিলাম, বুন্টু তখন সেখানেই ছিল। বিছানায় বসে পড়ছিল। পড়ার ফাঁকে ও যে কখন আমাদের কথাগুলো গিলে খেয়ে বসেছিল, বুঝতেই পারিনি। একদিন হঠাৎ ও চকদিঘির কথাটা তুলল। মায়ের কাছে এসব বলার সাহস বুন্টুর নেই। ওর স্বভাবটা প্রায় আমারই মতো। তাই যত ঘুরে বেড়ানোর আবদার আমার কাছেই।

পড়তে-পড়তে এইভাবে বড়দের কথায় কান দেওয়ার জন্য একটু বকলাম বুন্টুকে। আবার ভাবলাম, ওরই বা দোষ কী! ওর সামনে বকবক করলে ও তো শুনবেই।

বুন্টুর সমর্থন পেয়ে মনে-মনে আমিও কিন্তু একটু চাঙা হচ্ছিলাম। লজ্জার মাথা খেয়ে বলেই ফেললাম বুন্টুর মাকে, "বুন্টুর যখন এতই ইচ্ছে, চলো না গরমের ছুটিতে সকলে মিলে ঘুরে আসি চকদিঘি।"

গীতালি রাজি হল না। বলল, "গেলে তোমরা যাও গে। আমি যাব না। ওই সব হাবজি-গাবজি জায়গায় গিয়ে শরীরকে

কষ্ট দেওয়া পোষায় না।"

অনেক আগে শুনেছিলাম চকদিঘির রাজবাড়ির মায়াবী এবং রহস্যজনক ঘটনাবলির কথা। এমন নিঝুম নিস্তব্ধ ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকা আর ঘন জঙ্গলঘেরা পরিবেশ যে, দিনদুপুরেও নাকি ওখানে যেতে গা ছমছম করে! তারপর আবার শঙ্করের মুখেও একই কথা শুনলাম। দু'টো শোনার মধ্যে মিল খুঁজে পেয়ে মনটা উচাটন হয়ে ওঠে। গীতালি নিজে না গেলেও আমাদের যাওয়ার ব্যাপারে তেমনভাবে কোনও প্রতিবাদ না করায়, সেটাকে মূলধন করে শঙ্করকে বললাম আবার আমাদের সঙ্গ দেওয়ার জন্য। শঙ্করকে সঙ্গে নেওয়ার কারণ হল, ওর এক বন্ধুর বাড়ি ওই গ্রামেই। তার সঙ্গেই শঙ্কর ঘুরে এসেছে বর্ধমানের চকদিঘি রাজবাড়িতে।

শঙ্কর ঘোঁতঘোঁত করছিল। চেপে ধরতে না করতে পারেনি ও। দিনক্ষণ ঠিক করে ওর চকদিঘির বন্ধু দেবাশিসকে খবর দিল শঙ্কর। দেবাশিসের সম্মতি পাওয়ার পর আমি আর বুন্টু রওনা দিলাম। শঙ্কর তারকেশ্বর স্টেশনে অপেক্ষা করবে। তারকেশ্বর থেকে বাসে চেপে চকদিঘির ফকিরসাহেবতলা বাসস্টপে নেমে রাজবাড়ি যাওয়ার পথ। দেবাশিস ওই ফকিরসাহেবতলাতেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে।

আমরা যখন ফকিরসাহেবতলায় নামলাম, তখন বেলা তিনটে। পৌঁছনোর কথা ছিল বেলা দশটায়। সেইমতো আমরা ভোর-ভোর বাড়ি থেকে রওনা দিই। হরিপাল স্টেশনে ট্রেন অবরোধের জন্যে এই বিভ্রাট। গীতালিকে বলে এসেছিলাম আমরা আজই ফিরে আসব। সেজন্যই অত সকালে বেড়িয়ে পড়ি। কিন্তু পরিস্থিতি যা, আজ ফেরা যাবে কি না বোঝা যাচ্ছে না। দেবাশিস যেহেতু বাসস্টপে অপেক্ষা করবে, ওখান থেকেই ওকে নিয়ে সরাসরি রাজবাড়ি যাওয়া যায় কি না ভাবতে লাগলাম। অবশ্য কথা ছিল দেবাশিসদের বাড়ি হয়ে একসঙ্গে সবাই মিলে যাব। তাই দেবাশিস রাজি হবে বলে মনে হয় না।

পারলাম না আমার ইচ্ছেটাকে কাজে লাগাতে। বাস থেকে নেমে প্রথমে বাড়ি ফেরার কথাটা তুলতেই হাঁ হাঁ করে উঠল দেবাশিস। শঙ্করকে এক ধমক দিয়ে বলল, "তোরা তা হলে এলি কেন? তারকেশ্বর থেকেই তো ফিরে যেতে পারতিস।"

মুখ ছোট করে শঙ্কর আমার দিকে তাকাল। আর তখনই দেবাশিসের সঙ্গে আমার সরাসরি আলাপ হল। আমি বললাম, "ওটা শঙ্করের কথা নয়। আমার কথা। আমিই শঙ্করকে বলেছিলাম। ঠিক আছে ভাই। এখন চলো। পরিস্থিতি যেমন হবে তেমন করা যাবে।"

"পরিস্থিতি যেমন তেমন নয়। আজ ফেরা যাবেই না। এত বেলায় এসে আবার এতটা রাস্তা ফেরা যায় না কি! আমরাই বা আপনাদের ছাড়ব কোন মুখে।"

আর কথা না বাড়িয়ে আমরা পা চালালাম দেবাশিসদের বাড়ির দিকে। যতই আমরা গ্রামের ভিতর ঢুকছি, গ্রামের গাছগাছালি আর শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে মনটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। যেন মনের সমস্ত মালিন্য ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাচ্ছে। বুন্টু অবাক চোখে প্রকৃতিকে যেন গবগব করে গিলে খাচ্ছে। কিশোরসুলভ আনন্দে বিগলিত বুন্টু, দ্রুত তালে আমাদের আগে আগে হেঁটে চলেছে। এত কষ্টকর ও একঘেয়ে ট্রেন-বাস জার্নির ক্লান্তি বিন্দুমাত্র ওর মধ্যে দেখা গেল না।

দেবাশিসদের আতিথেয়তায় আমরা

আপ্লুত হয়ে গেলাম। আমরা শহুরেরা ভাবতেই পারি না মানুষকে এত আপন করে নেওয়া যায়। একটা শিক্ষাও পেলাম এখানে এসে।

দেড় ঘণ্টা কেটে গেল দেবাশিসদের বাড়িতে, ওদের যত্ন-খাতির খেতে খেতে। আমাদের মন এদিকে ব্যস্ত হয়ে উঠছে রাজবাড়ি যাওয়ার জন্য। বুন্টুকে বললাম তৈরি হয়ে নিতে। দেবাশিসের ছেলে আকাশ বলল, "প্রত্যেকের সঙ্গে একটা করে লাঠি এবং কয়েকটা টর্চ নেওয়া দরকার। যা পোড়ো এলাকা। বিষধর সাপটাপ তো যখন-তখন ঘোরাঘুরি করে। দিনরাত বলে ওদের কাছে আলাদা কিছু নেই। ধসে পড়া বাড়িটা, বোড়া সাপ, তেঁতুলে আর কাঁকড়া বিছের তো স্বর্গরাজ্য। তারপর ইঁদুর, ছুঁচো, ভাম-খটাশের কথা ছেড়েই দিলাম।"

পলেস্তরা খসা লাল ইটের বড়-বড় দু'টো থাম ভেদ করে আমরা শুরু করলাম আমাদের সেই বহু প্রতিক্ষিত চকদিঘির রাজবাড়ি অভিযান। পিলারের শরীর দেখে বোঝা যায় কী প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড লোহার গেট ছিল এখানে। থামের কয়েক জায়গায় লোহার হাঁসকলের অবশিষ্ট এখনও আটকে আছে। কয়েক পা একটু ফাঁকা জায়গার পর শুরু হল বিশাল আম, জাম, শাল-মেহগনির জঙ্গল। আরও কত যে গাছগাছালিতে ভরা গোটা এলাকাটা। তারই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে একটা রাস্তা। রাজবাড়িতে ঢোকার মূল রাস্তা ছিল এটা। একসময়ের প্রশস্ত রাস্তা লতা-গুল্মে ভরে এখন সরু হয়ে গিয়েছে। গাছের ডালপালা ঝুলে নেমে এসেছে রাস্তার উপর। তারই তলা দিয়ে আমরা চলেছি সন্তর্পণে। লাউডগা সাপ গাছের উপর থেকে গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আর গাছের পাতায় লকলক করা জোঁক যদি কোনও রকমে ঘাড়ে বা মাথায় একবার ঘাপটি মেরে বসতে পারে, তা হলে রক্তারক্তি হতে আর কতক্ষণ!

সামনাসামনি বাড়িঘর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঘন গাছপালায় একাকার গোটা এলাকা। দেবাশিস বলল, "এখনও খানিকটা যেতে হবে, তবে অন্দরমহলের সদর দরজা আমরা দেখতে পাব।"

এই গরমের পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটাতেই মনে হচ্ছে সন্ধে নেমে এসেছে। সেইসঙ্গে স্তব্ধ চরাচর। গাছের ডালের ঘর্ষণে খটাস-খট, ঘড়-ড়-ড় শব্দ! সান্ধ্য পাখির ডাক। পরিবেশটা যেন এক ভয়ার্ত মায়াবী আবেশে মোড়া। বাতাসে হঠাৎ-হঠাৎ ভেসে বেড়ানো অজানা এক শব্দে চমকে উঠতে হচ্ছে আমাদের! বুন্টু আর আকাশ এগিয়ে চলেছে সকলের আগে। একবার একটু উচ্চ কণ্ঠে সতর্ক করলাম ওদের। করলে কী হবে! সে কথায় ভ্রূক্ষেপ নেই ওদের। দেবাশিসও দেখি, আমল দিল না আমার কথায়। বলল, "এই বয়সের বাচ্চারা ওরকমই হয়।" শঙ্করের দিকে তাকাতে ও শুধু মাথা নাড়ল। এই মাথা নাড়াটা আমার পক্ষে না বিপক্ষে, বোঝাই গেল না।

যত এগোচ্ছি, এই বিকেল বেলাতেই মনে হচ্ছে, আমরা কোন রাজপুত্রের পাতালপুরীতে প্রবেশ করছি। রাজবাড়ির বাইরের চত্বরে যদি এই পরিবেশ হয়, তা হলে ভিতরের অবস্থা কেমন হবে! এখন বুঝতে পারছি, বেরোবার সময় আকাশ যে লাঠি আর টর্চ সঙ্গে নিতে বলেছিল, তা কত সঠিক। তখন মনে-মনে আমি আকাশকে সমর্থন করছিলাম না। কী এমন পরিবেশ যে, দিনের বেলায় টর্চ দরকার! লাঠিরও বা দরকার কী? ওখানে ডালপালা, ইট-পাথরও কি পাওয়া যাবে না। ঘটা করে বাড়ি থেকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে! আমার ধারণা যে কত ভুল, এখন হাতেনাতে তার প্রমাণ পাচ্ছি।

দেবাশিস আমাকে বলল, "অনিমেষদা, দেখতে পাচ্ছেন, ওই দূরে বড় ডালটা বাঁ দিকে ফেলে তাকান! ওই যে বুন্টুদের দেখতে পাচ্ছেন না? ওরা প্রায় পৌঁছে গেছে অন্দরমহলের সদরের কাছাকাছি। ওখান থেকে একটু ডান দিকে বেঁকে গেলে বাড়িটা দেখতে পাব আমরা।

শঙ্করের আবার এই সব রাজবাড়িটাড়ির প্রতি তেমন টান নেই। ও গাছপালা প্রকৃতিই বেশি পছন্দ করে। ও আমাদের সঙ্গ ছেড়ে একা-একা বাগান, পুকুরচত্বরের দিকে চলে গেল। যেহেতু এই ক'দিন আগেও এখানে ঘুরে গিয়েছে, তাই একা-একাই এদিক-ওদিক যাওয়ার সাহস হয়ে গিয়েছে। দেবাশিস ওকে সাবধানে ঘোরাফেরা করতে বলে দিল।

রাজবাড়ির বংশধররা কেউই এখানে থাকে না। কেউ থাকে হুগলির উত্তরপাড়ায়, কেউ বা কলকাতায়। মানুষ

বসবাস না করলে, সে সামান্য কুঠি হোক বা বাংলো-রাজপ্রাসাদ হোক, তার কদর কোথায়! অযত্নে আর অনাদরে তার ভগ্নদশা হতে কতক্ষণ। দেবাশিস বলল, "মূল বাড়ির বাইরে যে বিশাল চাঁদোয়া আকারের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, ওটা হল রাজবাড়ির আটচালা। দুর্গা পুজো, কালী পুজো, হরিণাম কীর্তন সবই ওখানে হত। দেখছেন, বাড়ির ভিতর থেকে একটা ডানা যেন এই আটচালার সঙ্গে মিশেছে?"

"হ্যাঁ, তাই তো!" আমি বললাম।

"ওটা শুধুমাত্র বাড়ির মেয়েদের ভিতর থেকে পুজোমণ্ডপে আসা-যাওয়া করার ঘেরা রাস্তা ছিল। ওই রাস্তা দিয়ে কোনও পুরুষ মানুষের যাতায়াত করার আইন ছিল না। এখন দেখছেন, কেমন দেওয়াল খসে ইট-কাঠ-রড সব পড়ে-ঝরে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর ভিতরের চোখ ধাঁধানো মহলের পর মহল, সব শুনশান! পশ্চিম দিকের মহলের বার মুখের ছোট্ট ঘরটাই যা একটু সাফসুতরো দেখতে পাবেন। পলেস্তরা খসা ধুলো-বালির রমরমা পরিবেশে ওই জায়গাটুকু যেন একেবারেই বেমানান।"

"কেউ থাকে নাকি ওখানে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ, একজন বিহারি রাজমিস্ত্রি। সাহস বটে লোকটার! ওরও কোনও ঠাঁই হল না এ বাংলায়। এখানে মরতে পড়ে আছে। রাজবাড়ির বাবুরাও দেখলেন টুকটাক জরুরি মেরামতের জন্য সব সময় একজন মিস্ত্রির দরকার পড়ে। তাই ওকে রেখে দিয়েছেন।"

আমাদের পায়ের শব্দে হবে হয়তো, ওই ডানা বার করা মহিলা-রাস্তা দিয়ে দু'টো খটাশ শাঁ শাঁ করে ওদিকে পালাল। দেবাশিস বলল, "সাবধান অনিমেষদা। লাঠিটা সব সময় হাতে রাখবেন। ভুল করে কোথাও ফেলে আসবেন না। যে-কোনও সময় এরা আক্রমণ করতে পারে।"

অকস্মাৎ এমন দৃশ্যের মুখোমুখি হব ভাবতে পারিনি। না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না, এমন দিনের বেলায় চারিদিকে খটাশ ছোটাছুটি করতে পারে! দেবাশিসের সঙ্গে কথা হচ্ছিল হঠাৎ ক্যাঁ-অ্যা-অ্যা-চ করে তীক্ষ্ণ একটা শব্দ আমাদের কান কেটে বেরিয়ে গেল! শব্দটা এল বুন্টুদের দিক থেকে! ধকধক করে উঠল আমার বুকটা। "বু-উ-ন্টু-উ," বলে চিৎকার করে উঠলাম আমি! দেবাশিস সঙ্গে-সঙ্গে ধমক দিল, "কী হল, চিৎকার করছেন কেন?"

"না, ওই যে, কেমন একটা বিদঘুটে শব্দ হল! কীসের শব্দ? ওদের কোনও বিপদটিপদ হয়নি তো?"

"ওটা অন্দরমহলের প্রবেশদ্বার ঠেলে খোলার শব্দ। আকাশরা ঢুকছে। দরজার কব্জাগুলোয় জং ধরে মরচে পড়ে গিয়েছে। তাই খোলার সময় অমন শব্দ হচ্ছে।"

"কিন্তু ওরা সদর দরজার চাবি পেল কোথা থেকে? চাবি তো পুলিশের কাছে থাকে।" দেবাশিস নিজের মনে বিড়বিড় করতে থাকে।

দেবাশিসের কথাগুলো আমার কানে আসে। পুলিশের নাম শুনে আবার আমার অবাক হওয়ার পালা! পুলিশ কেন এই ভগ্নপুরীতে? পুলিশের কথা দেবাশিস আগে তো একবারও বলেনি। পুলিশের কথা যখন উঠল, তখন নিশ্চয়ই অন্যরকম কোনও রহস্য এর মধ্যে লুকিয়ে আছে। আর প্রশ্নগুলো নিজের কাছে ধরে রাখতে পারলাম না, "পুলিশ আবার এখানে কেন, দেবাশিস?"

দেবাশিসের তখন আমার কথায় কান নেই। মনে হল, তখনও ওর মাথায় সেই পুলিশ-ভাবনা তোলপাড় করছে। ও দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে গেল। বাড়ির গেটের কাছাকাছি পৌঁছে "আকাশ, আকাশ," বলে ডাকতে লাগল। আকাশ ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। বাবা-ছেলেয় নিজেদের মধ্যে কী সব কথা হল। এদের সব কাণ্ডকারখানা দেখে আমার তো বুকের ধকধকানি বাড়তে শুরু করল। অসুস্থ-অসুস্থ লাগছে যেন শরীরটা। ওদের কাউকে বললাম না আমার শরীর খারাপ লাগার কথা। তা হলে সঙ্গে-সঙ্গে ওরা আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, আর সকলের আনন্দের বাড়া ভাতে ছাই পড়বে।

কাউকে কিছু না বলে ভাল করেছি। দেবাশিস আকাশের সঙ্গে কথা বলে আমাকে ওদের দিকে আসতে ইশারা করল। ব্যাপারটা তেমন আতঙ্কের কিছু নয় বলে মনে হল। বুকের ধড়ফড়ানিটাও কমে এল।

দেবাশিস দাঁড়িয়ে ছিল সদরের ভিতর মুখটায়। আমি যেতে আমার সঙ্গ নিল। আমরা অন্দরমহলের প্রকাণ্ড একটা বারান্দায় পৌঁছলাম। দু' ধারে নানান সব মূর্তি বসানো। দেবাশিস এখন আমার গাইড। ওদিকে বুন্টু-আকাশ একজন পুলিশের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা রাজমহল। নিশ্চয়ই পুলিশটি বাধ্য ছেলের মতো ওদের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। তাই অত আগ্রহের সঙ্গে ওরা পুলিশের সঙ্গ নিয়েছে।

দেবাশিস বলল, "এই পরিটা বহুমূল্য ধাতু দিয়ে গড়া। এই যে নটরাজ, এটা গ্রানাইট পাথরের। ওই কোনারক মন্দিরের আদলের মূর্তিটা দেখতে পাচ্ছেন, ওটাও দামি ধাতু দিয়ে তৈরি। এই ভাবে অজন্তা-ইলোরা যুগের আদলের নানান মূর্তি সহ নানা ধরনের ধাতুর বাঘ, সিংহ সহ অন্যান্য জন্তুজানোয়ারের মূর্তি সারা রাজমহল জুড়ে সৌন্দর্য বর্ধন করত। এখন ওগুলো এই বারান্দায় আর ওদিকে কয়েকটা ঘরে রাখা আছে। ওই দেখুন, ওই দিকটায় সব জন্তু কেমন বসে কটকট করে চেয়ে আছে।

দেবাশিসের কথামতো এই সব বহুমূল্য মূর্তিগুলোর বাজারদর প্রায় কয়েক কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। আমি বললাম, "জমিদারের লোকজন আসে না এখানে?"

"বছরে এক-আধবার। মোটামুটি পুজোর সময় ওরা এখানে আসেন। দিনকতক থেকে হইহুল্লোড় করে চলে যান। খেয়াল রাখেন না ওঁরা, এই সব বহুমূল্য মূর্তির ক'টা আছে না আছে। একবার রাজ্যপাল এখানে এসেছিলেন। তিনি এগুলো দেখে অভিভূত হয়ে যান। খোঁজখবর করেন, কত মূর্তি আছে, কোথা থেকে কবে এগুলো কেনা বা তৈরি হয়েছিল। তখনই দলিল-দস্তাবেজের তলব হয় এবং দেখা যায়, বেশ কয়েকটি মূর্তির হদিশ নেই! জানা যায়, এসব চুরি হচ্ছে। তারপর যথারীতি থানা-পুলিশ। রাইটার্স পর্যন্ত গড়ায় ঘটনাটা। তখন থেকেই সরকার এখানে চব্বিশ ঘণ্টা পুলিশের ব্যবস্থা করে। নিয়ম হয়, রাজবাড়ির কারও বা পুলিশের অনুমতি ছাড়া এই চত্বরে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। বুন্টু আর আকাশ পুলিশকে

পটিয়ে-পাটিয়ে কখন যে সেই কাজটা সারল! আমার কাজ হাল্‌কা করে দিয়েছে। ওরা কেমন করে পুলিশকে পটাল সেটাই তখন ভাবছিলাম। পুলিশ কাউকে বাইরের চত্বরে যদি বা যেতে দেয়, অন্দরমহলে সহজে যেতে দেয় না। আর ভিতরে তো যেতেই দেয় না। আমি চিন্তায় ছিলাম ওরা আমাকে অনুমতি দেবে কি না। আগে কয়েকবার ওদের সঙ্গে অনেক কথা খরচ করে এবং প্রভাব খাটিয়ে অনুমতি আদায় করতে হয়েছিল।"

এতক্ষণে আমার পুলিশ-ভাবনার অবসান হল। হলঘর থেকে আমরা দেখতে পেলাম, বুন্টুরা একটি বড় ঘর থেকে আর একটি ঘরে ঢুকছে। বুন্টুর হাতে ফুট দু'-আড়াইয়ের মতো একটা চকচকে লোহার রড! দেবাশিসকে জিজ্ঞেস করলাম, "বুন্টুর হাতে রড কেন? ওর লাঠিটা কোথায় গেল? রডটাই বা ও পেল কোথা থেকে?"

"পুলিশের কাছ থেকে ম্যানেজ করেছে। ওরা যেভাবে পুলিশকে ম্যানেজ করতে পারে, তাতে ওদের কাছ থেকে সামান্য লোহার রড ম্যানেজ করা কী এমন ব্যাপার!"

দেবাশিস বলছিল, সত্যজিৎ রায় নাকি তাঁর 'ঘরে বাইরে' ছবির যাবতীয় শুটিং এই রাজবাড়ি এবং এই অঞ্চলে করেছিলেন। ও বলার সঙ্গে-সঙ্গে আমার চোখে ভেসে উঠল ঘরে বাইরে ছবির দৃশ্যগুলো। ছবির দৃশ্যের সঙ্গে যখন এই 'দৃশ্যে'র মিল খুঁজে পেলাম, এক দারুণ ভাললাগা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

এমনই এক দারুণ মুহূর্তে ওই ঘর থেকে বুন্টুর গলা শুনতে পেলাম। বুন্টু আঁ-আঁ করে বিকট চিৎকার করে উঠল! সঙ্গে-সঙ্গে আমরা ওই দিকে ছুটে যেতে-যেতেই ধপাস করে একজনের মেঝেয় পড়ে যাওয়ার শব্দ পেলাম। তারপর দেখি আকাশ আর পুলিশটি প্রাণপণে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!

ওরা ঘর থেকে পালিয়ে এল। বুন্টু এল না? প্রশ্ন আর তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমি তো তখন দিগ্বিদিকশূন্য। পৃথিবীর কোনও কিছুকেই আমি তখন তোয়াক্কা না করে রুদ্ধশ্বাসে ঢুকে পড়লাম ঘরটার মধ্যে। দেখি, বুন্টু উপুড় হয়ে পড়ে আছে। দ্রুত ওকে চিত করে শুইয়ে আমার কাঁধের বোতল থেকে জল নিয়ে ছিটিয়ে দিতে লাগলাম ওর চোখেমুখে। জ্ঞান নেই বুন্টুর। এই ভাবে খানিক শুশ্রূষার পর ও চোখ মেলে তাকাল। বুন্টুর মাথাটা দেবাশিসের কোলে। এতক্ষণে পুলিশটি আর আকাশ ঘরের ভিতরে এল।

দেবাশিস আকাশকে জিজ্ঞেস করল, "কী এমন ঘটনা ঘটল যে, তোরা এই সব কাণ্ড করে বসলি?"

আকাশ চোখ বড়-বড় করে বলল, "ওই যে, ওই পরিটা! হঠাৎ বুন্টুর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে! বুন্টু যত পিছিয়ে আসে, ও তত এগিয়ে আসে বুন্টুর দিকে। আমি আর রমেশদা ব্যাপারটা দেখে থতমত খেয়ে যাই। দেখি, আস্তে-আস্তে বুন্টুর চোখমুখ ভয়ে লাল হয়ে যাচ্ছে। থরথর করে ওর হাত-পা কাঁপছে! তারপর ও আর নিজেকে সামলাতে না পেরে চিৎকার করে মেঝেয় পড়ে যায়। ওর ওই অবস্থা দেখে প্রাণ ভয়ে আমি আর রমেশদা ছুট লাগাই।"

আমি "রমেশবাবু" বলে ডাকতে পুলিশটি বলল, "হ্যাঁ, দাদা। এত দিন এই রাজবাড়িতে ডিউটি করছি। দিনরাত এক করে এখানে কাজ করছি। এরকম দৃশ্যের মুখোমুখি কোনওদিন হতে হয়নি। বুন্টুর হাত থেকে লোহাটা ছিটকে শাঁ করে পরিটার গায়ে এমন সেঁটে ধরল! মনে হল, ওই লোহাটার মতো আমাদেরও গিলে খাবে পরিটা! তাৎক্ষণিক ভয়ভীতিতে নিজেকে সামলাতে পারলাম না। প্রাণভয়ে লাগালাম ছুট।"

পুলিশের কথা শোনার পর দেবাশিস আস্তে-আস্তে বুন্টুর মাথাটা কোল থেকে তুলে সিধে করে বসিয়ে দিল। সকলে এসে পড়ায় বুন্টুও এতক্ষণে যেন একটু শক্তপোক্ত হয়েছে। তবুও আমি পাশে বসে ওকে ধরে রইলাম।

দেবাশিস উঠে চলে গেল পরিটার কাছে। আলতো করে ওর গায়ে আটকে থাকা রডটায় টান মারল। পারল না নিতে। বেশ চেপেই বসে আছে লোহাটা পরির গায়ে। এবার জোর খাটিয়ে টানতে ওটার শরীর থেকে রডটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

কিঞ্চিৎ ভেবে দেবাশিস বলল, "চলো, রাত বাড়ছে। বাড়ি ফিরতে হবে।" ইতিমধ্যে চত্বরে কয়েকটা বাল্বের আলো জ্বালানো হয়েছে। প্রত্যেক ঘরেও একটা করে বাল্ব আছে। সেগুলোও জ্বলছে। আমরা চলে গেলে নিভিয়ে দেওয়া হবে সেগুলো।

এত বড় একটা ঘটনা ঘটল। আমরা এত লোক কৌতূহলের চরম সীমায় দাঁড়িয়ে। কেন এমনটা ঘটল তার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানতে পারলাম না। আর দেবাশিস কি না পরির শরীর থেকে রডটা টেনে কী ভাবল, আর নির্বিকার ভাবে বলল, "চলো বাড়ি যাই!"

আমি ছাড়ার পাত্র নই। দেবাশিসকে বললাম, "ব্যাপারটা কী হল বললে না যে! তুমি কী দেখলে, ভাবলে আর বাড়ি চললে?"

দেবাশিস মুচকি হেসে বলল, "অনিমেষদা, ঘটনাটা যেমন আকস্মিকভাবে ঘটেছে, তাতে এই পরিস্থিতি হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ঘটনার কারণটা নিতান্তই মামুলি। বুন্টুরা চোখ-কান খোলা রাখলে এই বিভ্রাটের মধ্যে ওদের পড়তে হত না। বুন্টুর হাতে এই যে রডটা ছিল, আসলে এটা একটা ম্যাগনেট বা চুম্বক। শক্তিশালী চুম্বক এটা। সেটা বুন্টু বা এখানকার অন্য কারও, এমনকী আমাদেরও জানার কথা নয়। রাজারাজড়াদের ব্যাপার এটা। কী জিনিস কোন কাজে লাগাত কে জানে! এখন এখানে অবহেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। পরীক্ষা না হওয়ায় পুলিশরাও জানত না এটা একটা ম্যাগনেট। তাই ওরা রডটাকে সাপ মারা, বুনো বিড়াল, খটাশ তাড়ানোর কাজে লাগাত। আর পরিটা খাঁটি লোহা মেশানো কোনও ধাতুর তৈরি। বুন্টুর হাতের ম্যাগনেটটা তার আকর্ষণ ক্ষমতার সীমার মধ্যে আসতেই তলায় চাকা লাগানো পরিটা গড়গড় করে বুন্টুর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। আর ওরা ভূতপ্রেত ভেবে ভয় পেয়ে এমন কাণ্ডটা ঘটায়।"

আমরা আশ্বস্ত হয়ে বাড়ি ফেরার পথ ধরি। দেবাশিসদের বাড়ি যখন ফিরি তখন রাত সাড়ে আটটা। ফিরেই গীতালিকে ফোন করে জানাই, আজ আর বাড়ি ফেরা যাবে না। তবে বুন্টুর ব্যাপারটা তখনকার মতো চেপে যাই।

পরদিন সকালে চা-জলখাবার খেয়ে দেবাশিসদের বাড়ির সকলকে বিদায় জানিয়ে আমরা বাড়ির পথে রওনা দিই।

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল

গল্প: শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বিপিনবাবুর বিপদ

ছবি: স্বপন দেবনাথ

জমজমাট রঙিন কমিক্স

(এ-সংখ্যায় শেষ কিস্তি)

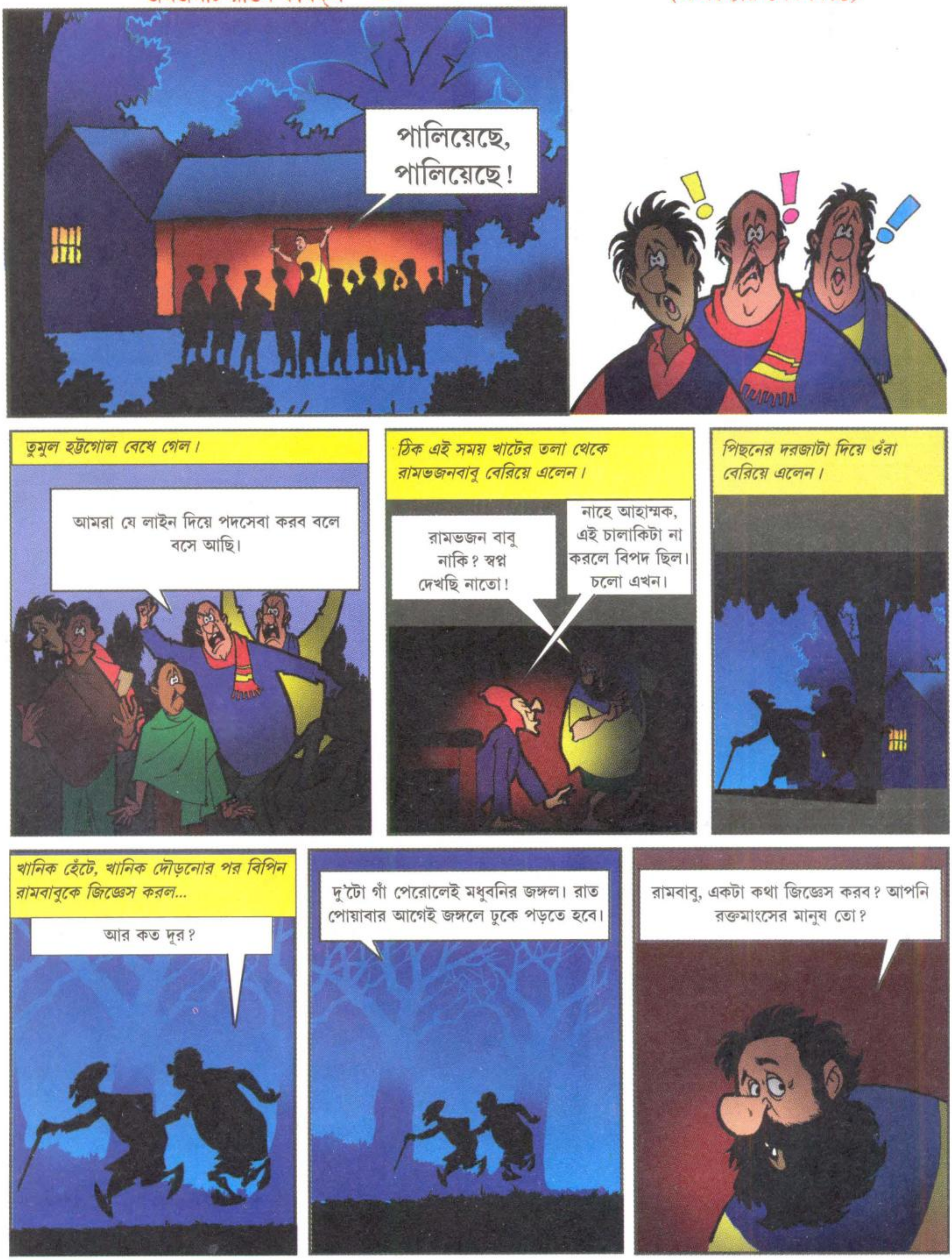

আপনার বয়স যেন কত হল ভজনবাবু?
একশো তিরিশ, তোমার চার গুণের বেশি।
ছুটতে-ছুটতে বিপিনবাবু চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। তবুও হাল ছাড়লেন না।
পুব দিকে তখন ভোরের আলো ফুটিফুটি করছে।
এই যে, এসে গেছি হে।
সামনে থেকে ভজনবাবু লাঠিটা এগিয়ে দিয়ে...
শক্ত করে ধরে থাকো হে বিপিন।
এই দ্যাখো, এই আমার ডেরা। ওই পুকুরের জলে হাত-মুখ ধুয়ে নাও গে।
কেমন বুঝছ হে বিপিন?
বিপিনবাবুর সর্বাঙ্গে এক লক্ষ ফোড়ার ব্যথা। তা হোক, তবু ভালই লাগছে।
সাপখোপ নেই তো ভজনবাবু?
তা মেলাই আছে। তবে শীতকালে তারা ঘুমোয়।

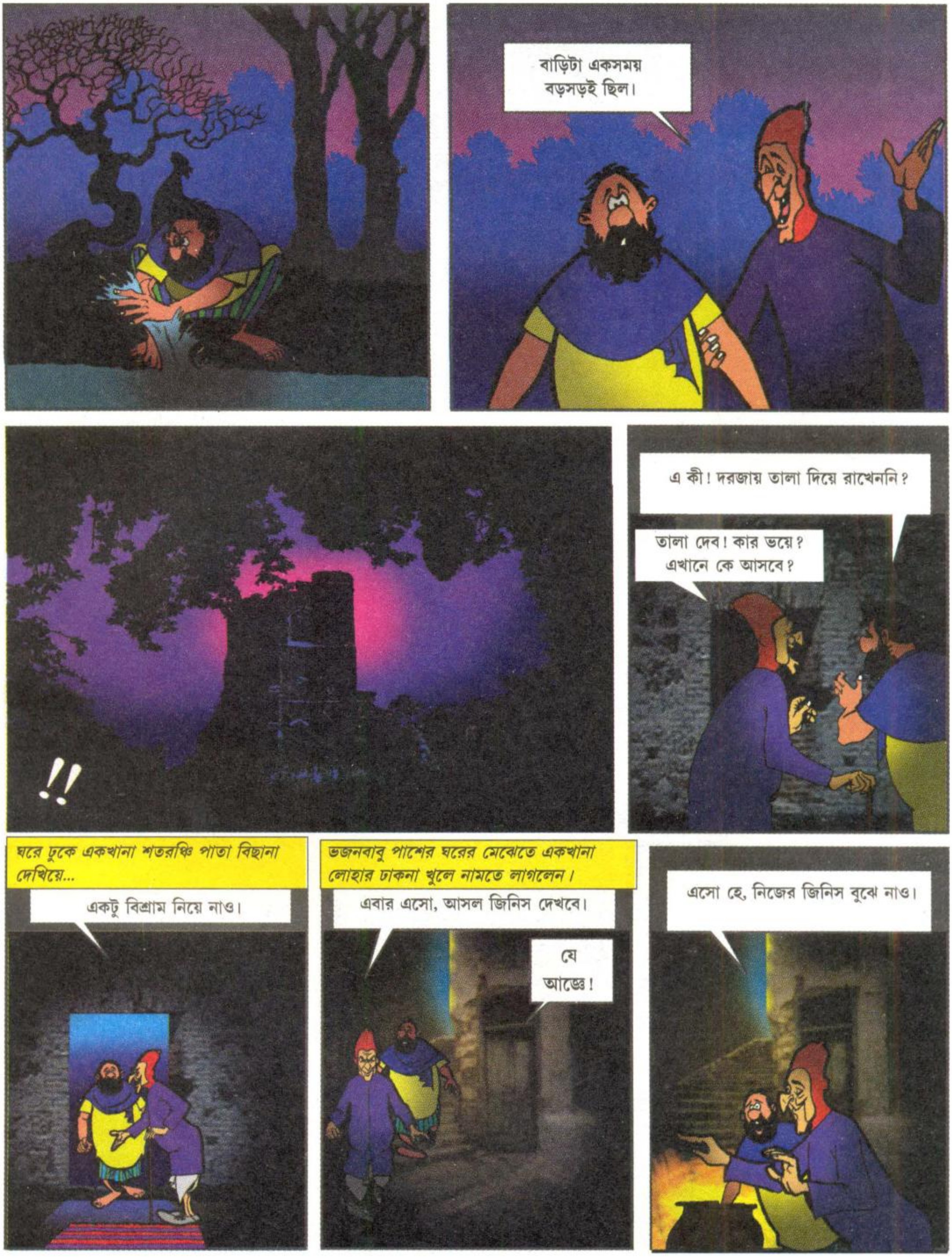
বাড়িটা একসময়
বড়সড়ই ছিল।
!!
এ কী! দরজায় তালা দিয়ে রাখেননি?
তালা দেব! কার ভয়ে?
এখানে কে আসবে?
ঘরে ঢুকে একখানা শতরঞ্চি পাতা বিছানা দেখিয়ে...
একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও।
ভজনবাবু পাশের ঘরের মেঝেতে একখানা লোহার ঢাকনা খুলে নামতে লাগলেন।
এবার এসো, আসল জিনিস দেখবে।
যে
আজ্ঞে!
এসো হে, নিজের জিনিস বুঝে নাও।

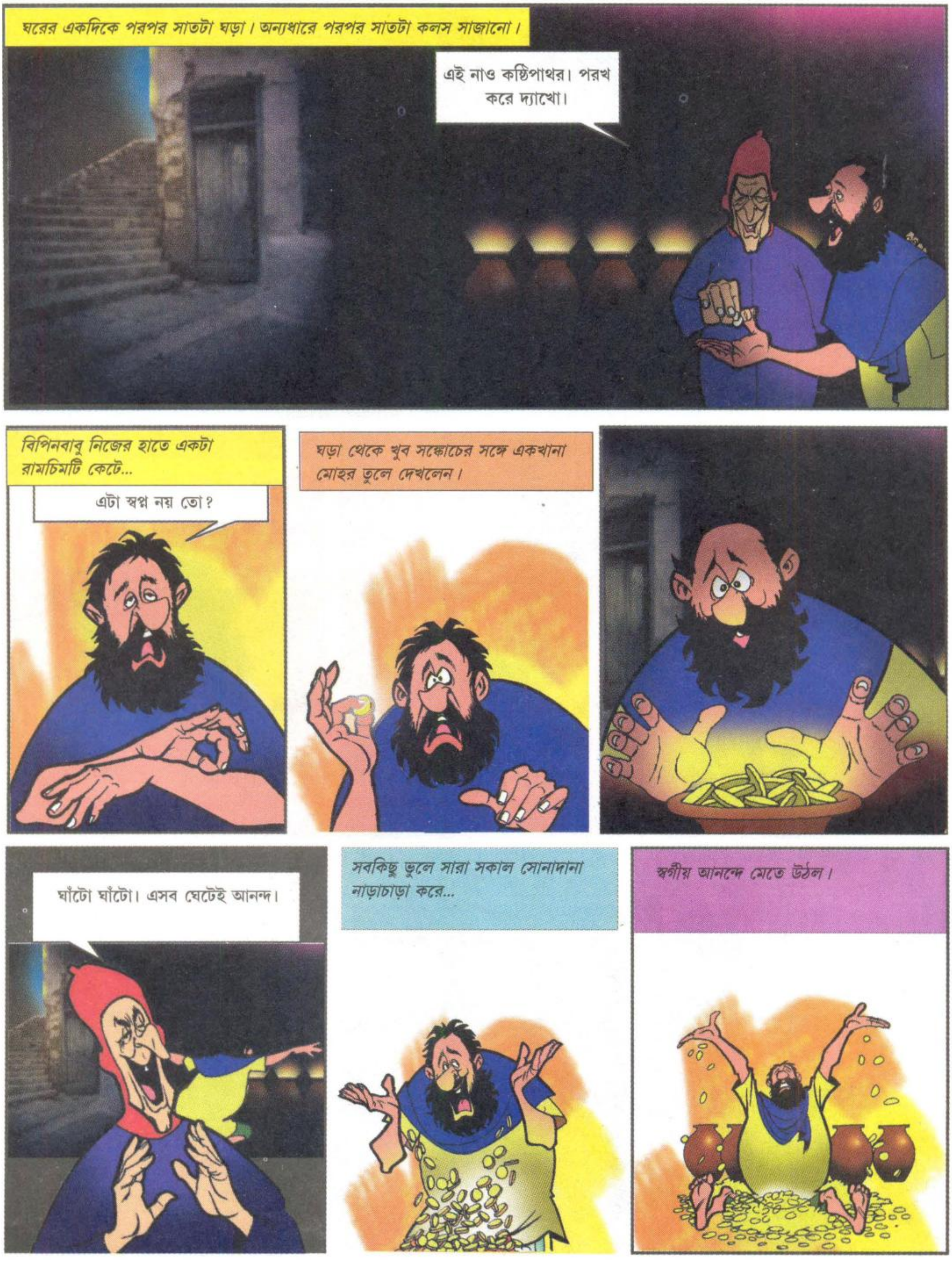
ঘরের একদিকে পরপর সাতটা ঘড়া। অন্যধারে পরপর সাতটা কলস সাজানো।
এই নাও কষ্টিপাথর। পরখ করে দ্যাখো।
বিপিনবাবু নিজের হাতে একটা রামচিমটি কেটে...
এটা স্বপ্ন নয় তো?
ঘড়া থেকে খুব সঙ্কোচের সঙ্গে একখানা মোহর তুলে দেখলেন।
ঘাঁটো ঘাঁটো। এসব ঘেটেই আনন্দ।
সবকিছু ভুলে সারা সকাল সোনাদানা নাড়াচাড়া করে...
স্বর্গীয় আনন্দে মেতে উঠল।

এদিকে পীতাম্বর ভাবল...
ওই গোবিন্দ ছোঁড়াই যা হোক একটু দাম দিল।
গোবিন্দর নানা অপকর্মে তাকে সাহায্য করতে হচ্ছে। রামভজনখুড়ো যখন মাঝরাতে চালাকি করে বিপিনকে নিয়ে পালালেন, তখন গোবিন্দ আর গোপাল হাটখোলার দিকে ছুটে গিয়েছিল।
হাটখোলার লোকে এ দু'জনকে ডান্ডা হাতে খুঁজে বেড়াচ্ছে।
কে আমাকে ডাকছে বলো তো, যেন ওদিকে যেতে বারণ করছে।
তোকে কি ভূতে পেল নাকি?
তাই হবে। তবে উপকারী ভূত। ওদিকে যাওয়া ঠিক হবে না।
আর রামভজনবাবু যে পালিয়েছেন, তার কী হবে? অত মোহর, হিরে?

কিন্তু আমার মন বলছে রামভজনবাবু এদিকে যাননি।
শেষে তুইও সিদ্ধাই হলি।
তারপর দু'জনে ফিরে এসে খড়ের গাদির মধ্যে সেঁধিয়ে বসার পর পীতাম্বর চারপাশটা দেখে নিল।
ওই মোহর, হিরে সে পাক না পাক, গোবিন্দ পেলেই সে খুশি।
কিন্তু রামভজনবুড়ো আর বিপিনের কাছ থেকে সব কেড়েকুড়ে নিতে পারবে দুধের বাছা গোবিন্দ?
চিতেন যদি ডালে ডালে চলে তো ভজনবাবু পাতায় পাতায়, কিন্তু চালটা ভজনবাবু দিলেনই বড় সোজা। চিতেন ভজনবাবু আর বিপিনদার পিছু নিয়ে জঙ্গলে পৌঁছে গেল।
নিশ্চয়ই কোনও ব্যাপার আছে।
আছেই তো!
কে বলল কথাটা?
পিছনে একটা টিয়াপাখির মতো পাখি বসে আছে (টিয়া পাখির ঠোঁটের নীচে অন্তত ইঞ্চিখানেক ঘন কালো দাড়ি ও মাথায় কালো চুল)।
আমি বললাম। কেন, দোষ হয়েছে তাতে?

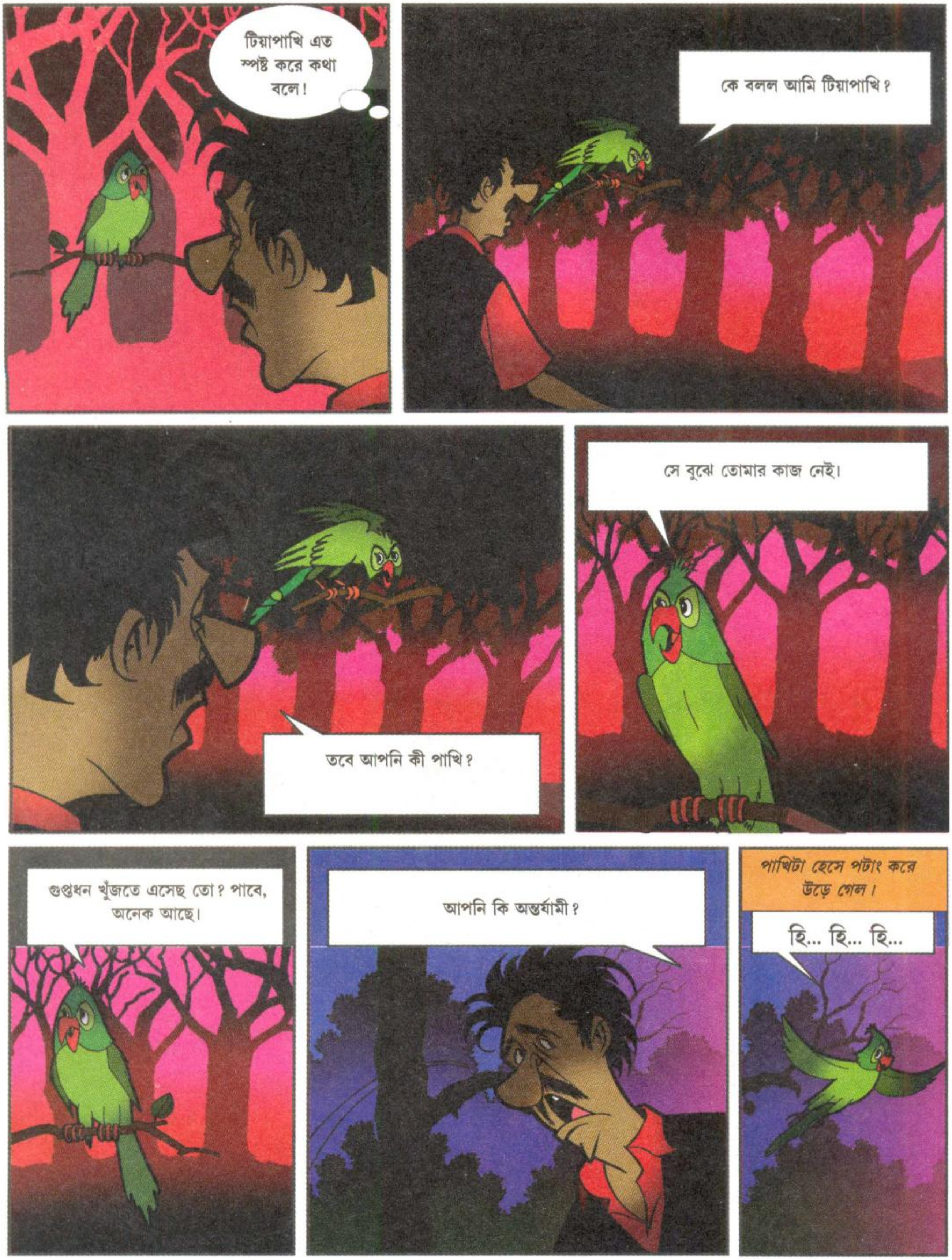
টিয়াপাখি এত স্পষ্ট করে কথা বলে!
কে বলল আমি টিয়াপাখি?
তবে আপনি কী পাখি?
সে বুঝে তোমার কাজ নেই।
গুপ্তধন খুঁজতে এসেছ তো? পাবে, অনেক আছে।
আপনি কি অন্তর্যামী?
পাখিটা হেসে পটাং করে উড়ে গেল।
হি... হি... হি...

চিতেন মুখটা উপরে তুলল। হনুমানের মতো একজন বসে আছে। লম্বা দাড়ি আর বড়-বড় বাবরি চুল তার। মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি।
কিছু বুঝলে চিতেনবাবু?
আজ্ঞে না।
তুমি বেশ শক্ত ধাতের লোক, তোমার হবে।
কী হবে?
যেমন হতে চাও।
হনুমানটা অদৃশ্য হয়ে গেল।
তারপর সেই সোজা সরল ডালপালাহীন আশ্চর্য গাছটা দেখতে গেল। বিপিনবাবুরা যে বাড়িটায় ঢুকেছিলেন, সেই বাড়িটায় চিতেন ওই গাছটায় ভর দিয়ে ঢুকতে গেল।

কিন্তু ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। উঠে দেখল একটা দাড়ি আর চুলওয়ালা খরগোশ। চিতেন আর অবাক হল না।
আপনারা কারা?
গুপ্তধন চাই তো! যাও না, ওই সোজা পথে ঢুকে যাও।
খরগোশ অদৃশ্য হল। চিতেন ধীরে-ধীরে বাড়ির ভিতরে ঢুকতে লাগল।
পীতাম্বর গোবিন্দর ঘুম ভাঙানোর জন্য কবিতা আউড়ে যাচ্ছিল।
কে রে এত ভ্যাজরং ভ্যাজরং করে?
পীতাম্বর বিরক্ত হল...
উঃ, এ যে জ্বালিয়ে খেল!
শোনোনি বাপু, যে শুইয়া থাকে তাহার ভাগ্যও শুইয়া থাকে।
এ তো সেই গলা! এ যে তার উপকারী ভূত!
শিগগির রওনা হয়ে পড়ো। মধুবনির জঙ্গলে সেঁধোও, তারপর আমি বলে দেব।
কী করতে হবে আজ্ঞে?

গোবিন্দ গোপালকে ঠেলে তুলল...
চলো গোপালদা, আর সময় নেই।
ভোরের আগেই মধুবনির জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল।
সোজা চলো, বটগাছ পেরিয়ে ডাইনে।
জঙ্গলের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় তিনজন খুনখুনে ডাইনিবুড়ি।
এবার বাঁয়ে।
আয় রে আমার সোনা, আয় রে আমার মানিক... আয় রে আমার রাজা, আয় রে আমার গজা...
দু'জনেই ছুট লাগাল।
পীতাম্বরের নির্দেশ মতো ওরা ভাঙা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বিপিনবাবু হিরে, মুক্তো ঘাঁটতে-ঘাঁটতে আত্মহারা হয়ে গিয়েছেন।
সবই আমায় দিয়ে দিলেন, দু'-চারখানা নিজের জন্য রাখবেন না?
তা ভজনবাবু, মোহর আর হিরেগুলো একটু বাইরে রোদের আলোয় দেখি।
ও কাজ করতে যেও না!
সিঁড়ি বেয়ে উপরে এসে বিপিনবাবু দেখলেন, কোথায় মোহর? এ যে সীসে, আর হিরের বদলে কিছু পাথরকুচি।
এ কী ভজনবাবু!
বললুম তো, যেখানকার জিনিস সেখানেই মানায় ভাল।
তুমি কৃপণ লোক, এসব তো আর প্রাণে ধরে খরচ করবে না! উপরে আনার দরকার কী?
তা বলে মোহর সীসে হয়ে যাবে কেন মশাই?
যাও বিপিন, নীচে যাও।
হঠাৎ একটা হুঙ্কার দিয়ে মস্ত ছোরা নিয়ে নেমে এল গোপাল আর গোবিন্দ।
হট যাও!

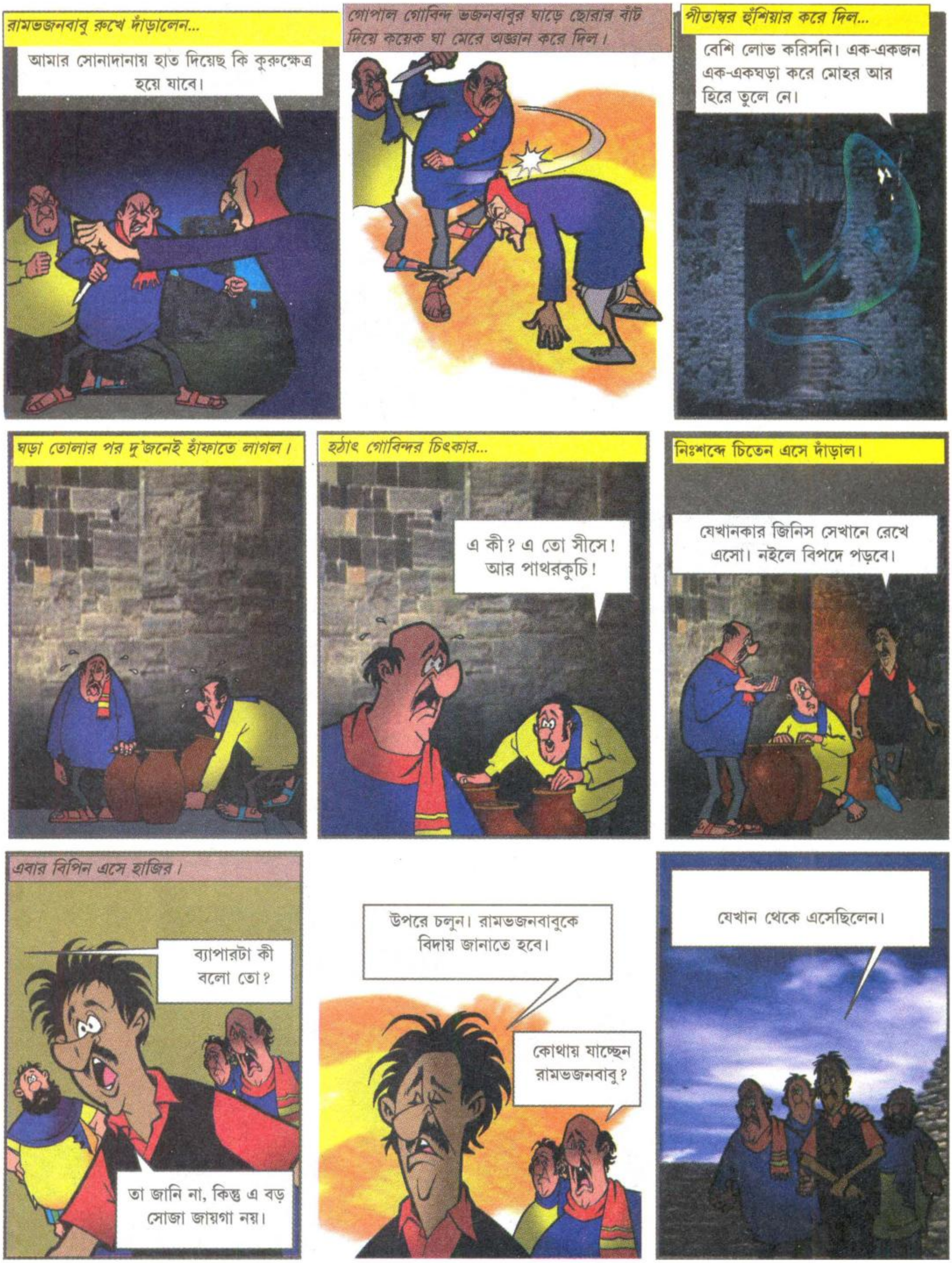
রামভজনবাবু রুখে দাঁড়ালেন...
আমার সোনাদানায় হাত দিয়েছ কি কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে।
গোপাল গোবিন্দ ভজনবাবুর ঘাড়ে ছোরার বাঁট দিয়ে কয়েক ঘা মেরে অজ্ঞান করে দিল।
পীতাম্বর হুঁশিয়ার করে দিল...
বেশি লোভ করিসনি। এক-একজন এক-একঘড়া করে মোহর আর হিরে তুলে নে।
ঘড়া তোলার পর দু'জনেই হাঁফাতে লাগল।
হঠাৎ গোবিন্দর চিৎকার...
এ কী? এ তো সীসে! আর পাথরকুচি!
নিঃশব্দে চিতেন এসে দাঁড়াল।
যেখানকার জিনিস সেখানে রেখে এসো। নইলে বিপদে পড়বে।
এবার বিপিন এসে হাজির।
ব্যাপারটা কী বলো তো?
তা জানি না, কিন্তু এ বড় সোজা জায়গা নয়।
উপরে চলুন। রামভজনবাবুকে বিদায় জানাতে হবে।
কোথায় যাচ্ছেন রামভজনবাবু?
যেখান থেকে এসেছিলেন।

চিতেন সকলকে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।
আকাশে!

রামভজনবাবু আসলে কে রে চিতেন?
মনে হয়, দেবদেবীদের একজন।

গোপাল সিদ্ধান্ত নিল।
গোবিন্দ আয় রে! আর গন্ডগোলের জীবনে জড়াব না। চুরি ছেড়ে অন্য লাইন ধরব।

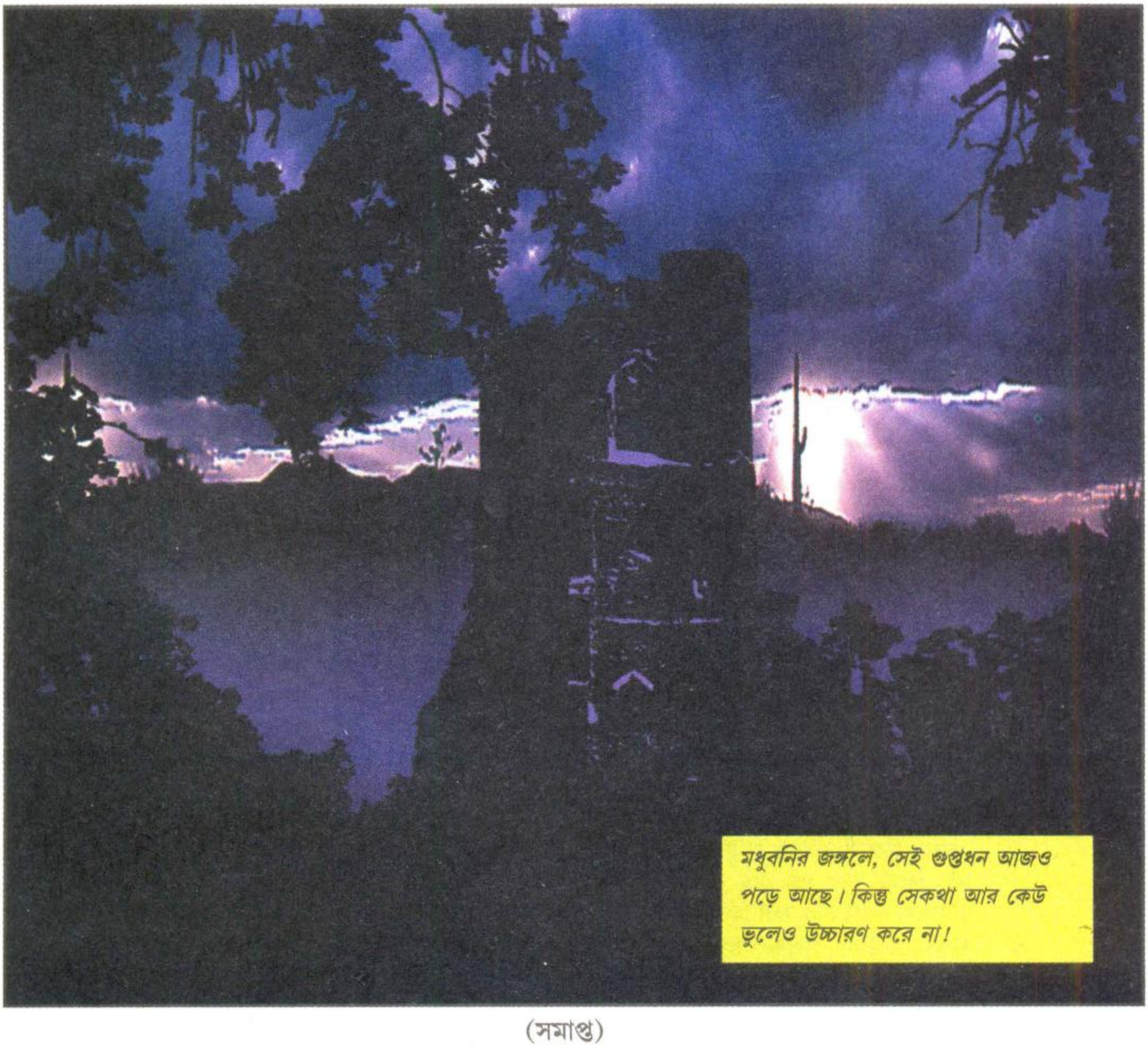
মধুবনির জঙ্গলে, সেই গুপ্তধন আজও পড়ে আছে। কিন্তু সেকথা আর কেউ ভুলেও উচ্চারণ করে না!

(সমাপ্ত)

অসুরগড়ের অদ্ভুত সাপ

সমীরকুমার ঘোষ

আমাদের অসুরগড়ে যাওয়ার প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন সায়নের বাবা সাত্যকি হালদার। সায়ন আমার বাল্যবন্ধু। নার্সারি থেকেই এক ক্লাসে পড়ছি আমরা। ওর বাবা কলকাতা মিউজিয়ামের কিউরেটর, মানে তত্ত্বাবধায়ক আরকী! তা সেদিন স্কুলের প্রোজেক্ট ফাইলের কাজ করার জন্য সায়নকে নিয়ে গিয়েছিলাম মিউজিয়ামে। ঘণ্টা চারেক ধরে ঘুরে-ঘুরে দরকারি তথ্যগুলো সংগ্রহ করে যখন বাড়ি ফিরব ভাবছি, সে সময় সায়নই বলল, "চল, একবার বাবার সঙ্গে দেখা করে যাই।"

"চল।"

সেদিন ভারী পরদা ঠেলে সায়নের বাবার ঘরে ঢোকা মাত্রই উনি আমাদের বসতে বলে আচমকাই প্রস্তাবটা দিলেন, "তোমরা যাবে নাকি অসুরগড়?"

"অসুরগড়?" আমি বিস্মিত হয়ে সায়নের মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, "হ্যাঁ, অসুরগড়। ওড়িশার কালাহান্ডি জেলায়।"

"কালাহান্ডি? সেই যেখানে ক'বছর আগে অনেকে না খেতে পেয়ে...!"

"ইয়েস। সেই কালাহান্ডি। ওই জেলারই অসুরগড় নামে একটা জায়গায় পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য খোঁড়াখুঁড়ি চালাচ্ছি আমরা। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু প্রাচীন মূর্তি ও শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। আমাদের যে দলটা ওখানে কাজ করছে, ওদের কিছু দরকারি জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাল এখান থেকে একটা নতুন দল যাবে। তোমরা ইচ্ছে করলে ওদের সঙ্গে গিয়ে জায়গাটা ঘুরে আসতে পার।"

"বেশ তো!" প্রস্তাবটা সঙ্গে-সঙ্গেই লুফে নিই আমরা। আর কিছু না হোক, একটা নতুন জায়গায় ঘুরে তো আসা যাবে। তা ছাড়া প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধানে

কীভাবে কাজ করছেন মানুষগুলো, তার একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও হবে। তাই বললাম, "কাকু, কীভাবে যাব আমরা?"

"কাল এখান থেকেই আমাদের বাস ছাড়বে ঠিক সকাল দশটায়।" একটা প্যাডের কাগজে কী যেন লিখতে-লিখতে উত্তর দিলেন তিনি।

॥ ২ ॥

হালদারকাকুর নির্দেশমতো ঠিক সময়েই পৌঁছে গেলাম আমরা। বাস ছাড়ল দশটাতেই। তার পরদিন অসুরগড় পৌঁছতে সকাল হয়ে গেল। বেশ বড় এলাকা। গড়ের এক দিকে মস্ত বড় দিঘি। অন্য দিকে চলছে গভীর খোঁড়াখুঁড়ি। বিশাল কর্মকাণ্ড। এক পাশে সযত্নে রেখে দেওয়া হয়েছে মাটির নিচ থেকে পাওয়া কয়েকটি প্রাচীন মূর্তি ও কিছু বাসনপত্র। কয়েকটি তো একেবারেই অবিকৃত।

দু' বন্ধুতে মিলে ঘুরে-ঘুরে কর্মকাণ্ড দেখছি। হঠাৎ কয়েকজন শ্রমিকের হাঁকডাক, চিৎকার, চেঁচামেচি শুনে ছুটে গিয়ে দেখি, মাটির নিচ থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি বড় আকারের সাপ। ছ' ফুটের বেশি লম্বা, নীলচে কালো রং, গায়ে ফুটফুট দাগ, বড় হাতার মাথার মতো উদ্যত ফণা। লেজের দিকটা একটু বেশি মোটা। আশ্চর্য হয়ে দেখি, দু'টো ছোট পা-ও রয়েছে লেজের দিকে।

এমন অদ্ভুত আকৃতির সাপ আগে দেখিনি কখনও। এত মানুষ দেখে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকা সাপটি মাটি থেকে ফুট দেড়েক উঁচু হয়ে বিশাল ফণা তুলে দুলতে থাকে সামনে।

এদিকে এত লোকের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ছুটে এসেছে গ্রামবাসীরাও। ওদেরই একজন শিবেন ওঁরাও। লোকটা ওঝা। হাতে ধরা একটা ছোট্ট গাছের ডাল। ও সাপটিকে দেখেই চিৎকার করে উঠল, "সরে যান বাবুরা, সরে যান। এ হল গিয়ে সাক্ষাৎ সর্পরাজ। এরে আগে আমারে ধরতি দ্যান।" হাতের ডালটা মাটিতে রেখে দু' হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলল লোকটা।

এর মধ্যে ওর কথা শুনে সরে দাঁড়াল সকলেই। শিবেন ওঝা সঙ্গে আনা ডালটা বাঁ হাতে আঁকড়ে ধরে সাপটার মুখের সামনে ঘোরাতে লাগল। সাপটা যেই ছোবল দিতে যাবে, শিবেন কী এক অদ্ভুত দক্ষতায় ডান হাত দিয়ে সাপটার গলাটা পিছন দিক দিয়ে চেপে ধরল।

ওফ, সে কী তেজ সাপটার। সজোরে চেপে ধরেও সাপটার তেজে শিবেন ওঝা আছড়ে পড়ল মাটিতে।

গ্রামেরই একজন মুহূর্তে বড় একটা মজবুত মাটির হাঁড়ি এনে দিল। শিবেন তার মধ্যেই ঢুকিয়ে দিল সাপটাকে। তারপর ঢাকনাটা বন্ধ করে দিল। সাপটার যাতে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে কোনও অসুবিধে না হয়, সেজন্য ছোট্ট একটা ফুটোও রাখা হল ঢাকনায়।

এতক্ষণে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফ্যালে সকলে। শিবেন বলল, "এ হল পাতালচর সাপ। এ জাতের সাপ মাটির উপর দেখবেন নাই বাবু।"

পাতালে চরে বেড়ায়! সেই যে এক রূপকথার গল্পে পড়েছিলাম, মাটির তলায় লুকিয়ে রাখা সোনাদানা পাহারা দেয় বিশাল এক সর্পরাজ। এ কী তা হলে সেই? এখানে কি সত্যিই কোনও গুপ্তধন লুকনো আছে, যেগুলো সাপটা পাহারা দিচ্ছিল এত কাল? কেননা, বংশপরম্পরায় স্থানীয় লোকদের আজও বিশ্বাস, এক সময় গোসিংহ নামে এক অত্যাচারী দৈত্যের আস্তানা ছিল এই গড়ে।

হঠাৎই আমাদের সঙ্গে আসা মিউজিয়ামের অফিসার শ্যামলেন্দু সেন

বললেন, "সাপটিকে আমরা নিয়ে যাব কলকাতায়।"

"কলকাতায়!"

"হ্যাঁ, ওখানে চিড়িয়াখানায় রাখতে পারলে অনেকেই এই বিরল প্রজাতির সাপটিকে দেখবার সুযোগ পাবে, তাই।"

"কীভাবে নেওয়া যাবে?" জানতে চাইলেন একজন।

"কেন? হাঁড়িতে যেভাবে আছে, ওভাবেই।" বললেন শ্যামলেন্দু সেন।

"কিন্তু পথে যদি কিছু হয়?" বলল সায়ন।

শ্যামলেন্দু সেন ওর পিঠে হাত রেখে বললেন, "একটা বড় কাঠের বাক্স করে আমাদের মিউজিয়ামের জন্য তিনটে প্রাচীন মূর্তি নিয়ে যাচ্ছি আমরা। আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীর। ওই বাক্সের ভিতরেই হাঁড়িটা রেখে বাসের মাথায় তুলে দেব। তা হলে আর ভয় কীসের?"

"বেশ!"

দুপুরের পর খাওয়াদাওয়া সেরে পুরাতাত্ত্বিক দলটির সঙ্গে আমরাও রওনা দিলাম কলকাতার পথে। মিউজিয়ামের সামনে এসে যখন পৌঁছলাম তখন মাঝরাত। অত রাতেও দরজার সামনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন হালদারবাবু। সাপটিকে নিয়ে আসার কথা ইতিমধ্যেই মোবাইলে জানানো হয়েছিল তাঁকে। আমরা বাস থেকে নামতেই জিজ্ঞেস করলেন তিনি, "সাপটি কোথায়?"

দু'-তিনজন কর্মী ততক্ষণে বাসের ছাদে উঠে দড়িদাড়া খুলে বাক্সটি নামালেন। উপরের কাঠ খুলে সন্তর্পণে হাঁড়িটা বের করে আনলেন। সাত্যকি হালদার মূর্তিগুলো ভিতরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁর নির্দেশ মতো বড় একটি হলঘরে রাখা হল মূর্তিগুলো। তার পাশেই মুখ ঢাকা সাপের হাঁড়িটা। হালদারকাকু জানিয়ে দিলেন, পরদিন সকালেই চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাপটিকে ওখানে রাখবার ব্যবস্থা করবেন তিনি।

সব কাজ মিটিয়ে সায়নদের গাড়িতে করে যখন বাড়ি ফিরি, তখন গভীর রাত।

॥ ৩ ॥

পরদিন নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই মিউজিয়ামে পৌঁছে সাত্যকি হালদার সাফাইকর্মীদের সাপটির কথা জানিয়ে সাবধানে হাঁড়িটিকে যথাস্থানে রেখে ঘরদোর পরিষ্কার করতে বললেন। খানিক পরেই শুরু হবে দর্শক সমাগম। নির্দেশ দিয়ে তিনি চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে উদ্যোগী হলেন। ফোনে কথা বলছেন, হঠাৎ একজন সাফাইকর্মী দৌড়ে এসে বলল, "মারাত্মক ঘটনা ঘটে গিয়েছে স্যার।"

"কী হয়েছে?"

"আমরা হাঁড়িটার কাছে গিয়ে দেখি, ঢাকনাটা ফাঁক করা, ভিতরে সাপটা নেই।"

"সাপটা নেই! সে কী?" আঁতকে উঠলেন কিউরেটর। চেয়ার ছেড়ে উঠে ভয়ার্ত গলায় বললেন, "এ তো মহা সর্বনাশ।"

মুহূর্তে হুলুস্থুলু পড়ে গেল মিউজিয়ামে। চারদিকে শুরু হয়ে গেল খোঁজাখুঁজি। জ্বেলে দেওয়া হল সব আলো। আনা হল টর্চ। তারপর টর্চের আলো ফেলে প্রতিটি ঘরের কোণে-কোণে আঁতিপাঁতি করে শুরু হল চিরুনিতল্লাশি। কিন্তু না। এত খোঁজাখুঁজিতেও সাপটার কোনও হদিশ মিলল না। এখন উপায়?

ইতিমধ্যে লোকজন জমতে শুরু করেছে বাইরে। 'অনিবার্য কারণে প্রবেশে বিলম্ব হবে' জানিয়ে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের। যারা দূর থেকে এসেছে, প্রতি মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে পড়ছে তারা।

অগত্যা সাত্যকি হালদার কর্মীদের নিয়ে আলোচনায় বসলেন। বললেন, "কী হতে পারে সাপটার?"

নানা জনে নানা মত দিলেন। কেউ বললেন, "রাতের আঁধারে গেট পেরিয়ে হয়তো ময়দানের দিকে চলে গিয়েছে সাপটা।"

"অসম্ভব।" আপত্তি জানালেন দু'-একজন, "ঘরের দরজা বন্ধ ছিল।"

"আহা, দরজা বন্ধ থাকলেও, দরজার তলায় যেটুকু ফাঁকা আছে, সেখান দিয়ে অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারে সাপটা।"

সত্যিই তাই। দেখা গেল, দরজার তলা দিয়ে সাপটার বাইরে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। আবার মিউজিয়ামের কর্মীদের কেউ মোটা টাকায় দুর্লভ সাপটিকে বেচবে বলে কৌশলে বের করে নিয়ে গেল কিনা, সে প্রশ্নও উঁকি দিল কিউরেটরের মাথায়।

তবে শেষ পর্যন্ত তন্নতন্ন করে খুঁজেও যখন কোনওভাবেই সাপটার কোনও হদিশ পাওয়া গেল না, তখন কিউরেটর সমস্ত কর্মীদের কড়া নজর রাখতে বলে দর্শনার্থীদের জন্য গেট খুলতে আদেশ দিলেন।

খোলা হল গেট। দর্শনার্থীরা ঢুকলেন একে-একে। প্রতি পদক্ষেপেই সতর্ক প্রহরা কর্মীদের। যে পথে যেভাবে যেতে বলছেন তাঁরা, সেইভাবেই দেখতে বাধ্য হচ্ছেন দর্শকরা। হঠাৎ কী হল বুঝে উঠতে পারছেন না তাঁরাও। বেশ খানিকক্ষণ পর সরীসৃপের ঘরে ঢুকে মায়ের হাত ধরে থাকা একটি ছোট্ট শিশু হঠাৎ বলল, "দ্যাখো মা দ্যাখো, ফণা তোলা সাপটা কেমন দুলছে দ্যাখো!"

"দুর বোকা! এখানে সাপ দুলবে কেন? ওগুলো সব স্টাফ করে রাখা। হাওয়ায় দুলছে বোধ হয়।"

"না মা, ভাল করে দ্যাখো।"

কথাটা কানে যায় এক নিরাপত্তাকর্মীর। সাপ দুলছে! দর্শকদের সরিয়ে কাছে যেতেই ধরা পড়ে ব্যাপারটা। এক দিক খোলা কাচের বাক্সের ভিতর যেখানে একটা ফণা তোলা সাপকে স্টাফ করে রাখা হয়েছে, ঠিক তার পাশেই অবিকল একই ভঙ্গিতে ফণা তুলে মানিকজোড়ের মতো বসে আছে পলাতক সর্পরাজ। খুব খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাচ্ছে, মাঝে-মাঝে দুলে উঠছে তার ফণাটি। খবর পেয়েই ছুটে আসেন কিউরেটর এবং অন্য কর্মীরাও।

আবার হুলুস্থুলু পড়ে যায় মিউজিয়ামে। মুহূর্তেই খালি করে দেওয়া হয় ঘর। কিউরেটর আর এক মুহূর্তও দেরি করেননি। প্রহরা বসিয়ে নিজের ঘরে এসে রিসিভার তোলেন, "হ্যালো চিড়িয়াখানা?"

"হ্যাঁ।"

"ইনচার্জ মিঃ সামন্ত আছেন?"

"হ্যাঁ, বলছি।"

"আমি কলকাতা মিউজিয়াম থেকে সাত্যকি হালদার বলছি। আপনাকে অসুরগড়ের যে সাপটার কথা বলেছিলাম, সেটিকে পাওয়া গিয়েছে।"

"তাই নাকি!"

"হ্যাঁ, মিঃ সামন্ত। আপনি যদি এখনই...।"

"ও কে... ও কে...।"

রিসিভার নামিয়ে রেখে একটা লম্বা শ্বাস ফেললেন সাত্যকি হালদার।

ছবি: দেবাশিস দেব

প্র যু ক্তি বি জ্ঞা ন

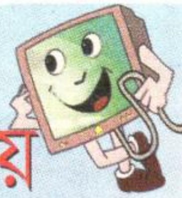

ই-মেল করো বাংলায়

বাংলায় ই-মেল করার উপায় এখন হাতের মুঠোয়।
জানিয়েছেন মনোজকুমার দ. গিরিশ

কম্পিউটারে বসে চিঠি লিখে চোখের পলকে তা পাঠানো যায় বন্ধুর কাছে। সে বন্ধু পাশের পাড়ারই হোক বা বিদেশেরই হোক। যেখানেই হোক, চিঠি মুহূর্তের মধ্যে বন্ধুর কাছে পৌঁছে যাবে। 'ই-মেল' কথাটির মানে হল ইলেকট্রনিক মেল। এতে কাগজ লাগে না, চিঠি পাঠাতে সময়ও বেশি লাগে না। চাই একটি কম্পিউটার, আর তাতে ইন্টারনেট কানেকশন।

এখন কম্পিউটারের যুগ। তাই অনেকেরই কম্পিউটার আছে, আছে ইন্টারনেট কানেকশনও। ইচ্ছে করলেই বন্ধুকে দরকার মতো ই-মেল করতেও পার। সেটা লিখতে হয় ইংরেজিতে। ইংরেজি হরফে বাংলা কথায়ও ই-মেল করা যায়। যেমন, Ami bhalo achhi, tui keman achhis? এ কিন্তু ঠিক মনের মতো হল কি!

এখন বাংলা হরফে ই-মেল করার সুযোগ এসে গিয়েছে। এত দিন বাংলায় কেন ই-মেল করা যেত না? অনেকের কম্পিউটারে বাংলা লেখার ব্যবস্থা নেই, অর্থাৎ বাংলা হরফ বা ফন্ট নেই বলে। তাই বাংলা লেখা না গেলে বাংলায় ই-মেল করাও যাবে না। আর যদি তোমার কম্পিউটারে বাংলা হরফ থাকে, তা দিয়ে তুমি বাংলা লিখতে পার। তা হলেই কি তুমি তোমার বন্ধুকে বাংলায় ই-মেল করতে পারবে?

উঁহু, পারবে না। কারণ, তোমার বন্ধুর কম্পিউটারে যদি বাংলা হরফ না থাকে, তা হলে সে বাংলায় লেখা ই-মেল পড়তে পারবে না। যদি তার বাংলা হরফ থাকেও, তা হলেও সে তোমার পাঠানো চিঠি পড়তে পারবে না। কারণ, এখন অনেক বাংলা কম্পিউটার সফটওয়্যার আছে, যার সাহায্যে বাংলা লেখা যায়। তোমার কম্পিউটারে যে বাংলা ফন্টের সফটওয়্যার আছে, তোমার বন্ধুর কম্পিউটারে সেই সফটওয়্যার নেই। তার আছে অন্য বাংলা ফন্টের সফটওয়্যার। তাই বাংলায় চিঠি পাঠালেও বন্ধু তা পড়তে পারবে না।

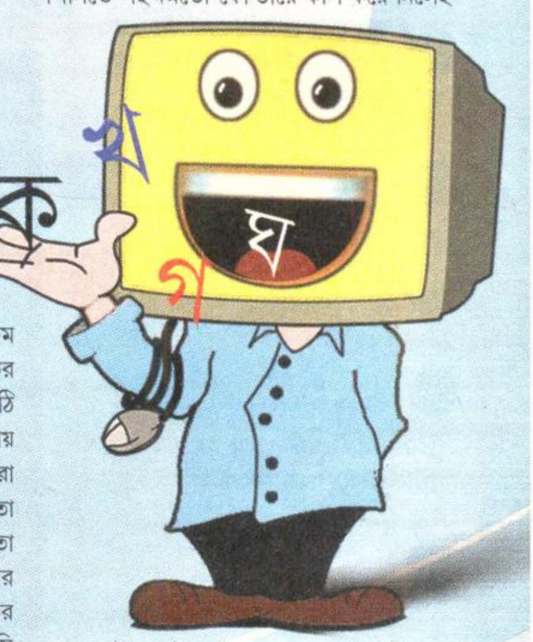

ইংরেজি ফন্টেরও আছে অনেক রকম সফটওয়্যার। কিন্তু যে-কোনও ইংরেজি ফন্টের সফটওয়্যার দিয়েই বন্ধুকে ইংরেজিতে চিঠি লিখলে, সে তা অনায়াসে পড়তে পারবে। বাংলায় লিখলে কেন পারবে না? তার কারণ হল, তোমরা কম্পিউটারে যে ইংরেজি কি-বোর্ড দ্যাখো, তা গোটা পৃথিবীতে একই রকম। কিন্তু বাংলায় তা নয়। তোমার বাংলা লেখার ব্যবস্থা আর তোমার বন্ধুর বাংলা লেখার ব্যবস্থায় ফন্টের তফাতের জন্য পড়া যাবে না। যদিও দু'টোই বাংলা! তুমি 'ক' লিখলে তোমার বন্ধুর কম্পিউটারে তা হতে পারে 'ট', কিংবা 'জ'। তাই তোমার চিঠি বন্ধুর কম্পিউটারে হিজিবিজি লেখা হয়ে দেখা দেবে। তুমি 'কাকা' লিখলে তোমার বন্ধুর কম্পিউটারে তা হবে 'টাটা'। এমনকী সেটা আদৌ বাংলা হরফ না-ও হতে পারে। দু'জনের যদি একই বাংলা সফটওয়্যার থাকে, তা হলে সমস্যাই নেই। কিন্তু দু'জনের যদি এক ধরনের বাংলা সফটওয়্যার না-ও থাকে, তা হলে খরচ করে নতুন সফটওয়্যার না কিনেও সমস্যা মেটানো যায়। একটা ওয়েবসাইট আছে www.srishti-sandhan.com নামে। এই ওয়েবসাইটে যেতে হলে দরকার ইন্টারনেট কানেকশনের। ইন্টারনেট হল টেলিফোনের তারের মাধ্যমে এক ধরনের বিশেষ সংযোগ। এই ওয়েবসাইটে পৌঁছে সেখান থেকে দরকারি বাংলা সফটওয়্যার ডাউন-লোড করে নিতে পার নিজের কম্পিউটারে।

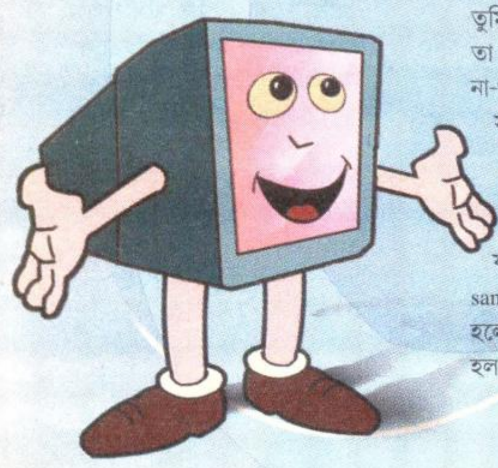

কীভাবে করতে হবে? ইন্টারনেটের মাধ্যমে ওই ওয়েবসাইটে পৌঁছে ডান দিকের প্রথম বিষয়টি ক্লিক করতে হবে, তারপরে নীচে গিয়ে 'ইউটিলিটিস'-এ ক্লিক করবে। তারপরে একেবারে উপরে গিয়ে সেখানে Next Generation of Bengali fonts Download -এ ক্লিক করতে হবে। যদি তখন কম্পিউটারের পরদায় তিনটি পছন্দের একটিতে Quit দেখায়, তবে তার উপরে ক্লিক করবে। একটু পরেই আবার কম্পিউটারের পরদায় তিনটি পছন্দের একটিতে আসবে Save, তখন Save-এর উপর ক্লিক করতে হবে। তারপরে সেটি নিজের পিসিতে পছন্দমতো ফোল্ডারে কপি করে নিলেই হল। এই সফটওয়্যারের সঙ্গে যে ফন্টগুলো থাকবে সেগুলো নিজের পিসির ফন্ট-ফোল্ডারে ইনস্টল করে নিতে হবে। অন্য যে ফোল্ডার আছে, সেই ফোল্ডারের মধ্যে আছে FONT ফোল্ডার, তা খুলে ফ্যালো। তার ভিতর থেকে ফন্টগুলো সবই মার্ক করে মাউস দিয়ে টেনে তোমার কম্পিউটারের মধ্যে C/WINDOWS/FONT folder-এ দিলেই ইনস্টল হয়ে যাবে (drag and drop system)। তা হলেই কেল্লাফতে!

যেসব ফাইল ডাউন-লোড করেছ, এবারে তা খুলে পড়ে-পড়ে রপ্ত হয়ে নাও। আর বন্ধুদের তো বটেই, 'আনন্দমেলা'য়ও বাংলায় ই-মেল করো মনের আনন্দে!

ছবি: সঞ্জীবন বসু

কুইজ়

ঘটনার ঘনঘটায় শেষ হয়ে এল ২০০৬ সাল, সামনে নতুন একটি বছর। এ বছরের মনে রাখার মতো কিছু ঘটনা নিয়ে এবারের কুইজ়।

১ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়নের বিচারে প্লুটো তার গ্রহত্ব হারালেও এ বছরই প্লুটোয় পাঠানো হয়েছে এক মহাকাশযান। বলতে পার সেই মহাকাশযানের নাম কী?

২ বিশ্বকাপ ফুটবলে এ বছর থেকেই প্রথম দেওয়া শুরু হল 'বেস্ট ইয়ং প্লেয়ার' পুরস্কার। জার্মানির কোন ফুটবল খেলোয়ার প্রথম এই পুরস্কার পেলেন?

৩ এ বছর ৩ জুন একটি দেশ ভেঙে জন্ম নিল আর-একটি নতুন দেশ। বলতে পারো কোন দেশ ভেঙে জন্ম হল কোন দেশের?

৪ প্রথম ভারতীয় অভিনেতা হিসেবে কোনও ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি পেলেন তিনি। লেস্টারের ডি মন্টফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দিল এই সম্মান। কে ইনি?

৫ এ বছরই পন্ডিচেরি ফিরে গেল তার পুরনো নামে। এখন থেকে তাকে ডাকা হবে পুডুচেরি নামে। এর অর্থ কী?

৬ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে এবং প্রজাতন্ত্র দিবসে লাল কেল্লা থেকে বেজেছিল তাঁরই গান। পরিচালক গৌতম ঘোষ তাঁকে নিয়ে তৈরি করেছেন 'সঙ্গ-এ-মিল সে মুলাকাত' নামের তথ্যচিত্র। এ বছরই জীবনাবসান হল এই প্রবাদপ্রতিম সঙ্গীত শিল্পীর। কে ইনি?

৭ বিশ্বের উচ্চতম রেলপথ চালু হল এ বছর। কোন দুই দেশের মধ্যে চলছে এই রেলগাড়ি?

৮ কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের এ বছর প্রকাশিত আত্মজীবনীর নাম 'ইন দ্য লাইন অফ ফায়ার'?

অভিজিৎ সুকুল
তনুশঙ্কর চক্রবর্তী

গত সংখ্যার উত্তর

১. সুভাষচন্দ্র বসু।
২. ইস্টার আইল্যান্ড।
৩. রোনাল্ডিনহো।
৪. কিউ (Queue)।
৫. পান্না কোথায়।
৬. মুম্বই।
৭. বেঞ্জামিন বেকার (জার্মানি)।
৮. বন্দে মাতরম।

জবাব চাই

১. 'দ্য ক্রোকোডাইল হান্টার' নামে পরিচিত এই অস্ট্রেলিয় পশুপ্রেমী এবং পরিবেশবিদের মৃত্যু হল এ বছর। বলতে পার তাঁর নাম?
২. বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনালে কাকে মাথা দিয়ে ঢুঁসো মেরে লাল কার্ড দেখেন জিনেদিন জিদান?
৩. দীর্ঘ ৩৫ বছর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ়কে তাদের দেশে হারিয়ে টেস্ট সিরিজ় জিতল ভারত এ বছর। এই সিরিজ়ে 'ম্যান অফ দ্য সিরিজ়' কে হলেন?
(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার জবাব চাই-এর উত্তর

১. পঙ্কজ আডবানি।
২. মার্টিন ড্যাম (Martin Damm)।
৩. কিউবা।

সঠিক উত্তরদাতা

সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, বার্নপুর (ই-মেল মারফত); **সম্পূর্ণাভারতী দাস,** সপ্তম শ্রেণি, গসপেল হোম স্কুল; **অনীক নন্দী,** অষ্টম শ্রেণি, বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়; **রক্তিমাভ বসু,** সপ্তম শ্রেণি, নব নালন্দা হাই স্কুল, কলকাতা; **অঞ্জন নন্দী,** নবম শ্রেণি, আরামবাগ হাই স্কুল, হুগলি; **শ্রেয়ান ঘোষ** এবং **সায়ক চট্টোপাধ্যায়,** সপ্তম শ্রেণি, পাঠভবন, শান্তিনিকেতন; **অরূপ দত্ত,** ছোটনীলপুর, পশ্চিম পাড়া, বর্ধমান; **শৌভিক সামন্ত,** সপ্তম শ্রেণি, তমলুক হ্যামিলটন হাই স্কুল, পূর্ব মেদিনীপুর; **জয়ন্ত ঘোষ,** দশম শ্রেণি, বন্দিপুর আইডিয়াল একাডেমি (বালক), রহড়া, উত্তর ২৪ পরগনা; **জীবন দাস,** দ্বাদশ শ্রেণি, গঙ্গারামপুর উচ্চ বিদ্যালয়, দক্ষিণ দিনাজপুর; **শিল্পা দাস,** একাদশ শ্রেণি, ওয়েল্যান্ড গোল্ডস্মিথ স্কুল; **অর্কপ্রভ গঙ্গোপাধ্যায়,** ষষ্ঠ শ্রেণি, হুগলি কলেজিয়েট স্কুল; **অভিষেক দাস,** অষ্টম শ্রেণি, ইলিয়াস মেয়ার স্কুল, কলকাতা; **শুভদীপ সেনগুপ্ত,** একাদশ শ্রেণি, হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল, হুগলি; **অপরূপ আইচ,** একাদশ শ্রেণি, রিষড়া বাণী ভারতী, রিষড়া, হুগলি; **তারিক আনোয়ার** এবং **চিরন্তন ভৌমিক,** দশম শ্রেণি, বহরমপুর জে এন

একাডেমি, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ; **অর্পণ দাস** এবং **অর্ণব মাঝি,** ষষ্ঠ শ্রেণি, হাওড়া জিলা স্কুল; **সুতনু বন্দ্যোপাধ্যায়,** নবম শ্রেণি, সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল; **সৈকত ঘোষ,** দশম শ্রেণি, নারকেলডাঙা হাই স্কুল, কলকাতা; **দীপন পুশহিলাল,** দশম শ্রেণি, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইনস্টিটিউশন, কলকাতা; **চৈতালি রায়,** নবম শ্রেণি, নিউ ব্যারাকপুর কলোনি গার্লস হাই স্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা।

জবাব চাই-এর উত্তর পাঠানোর ঠিকানা:
আনন্দমেলা, জবাব চাই,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০০১।
ই-মেল
anandamela@abpmail.com

পাঠভবন (ডানকুনি)

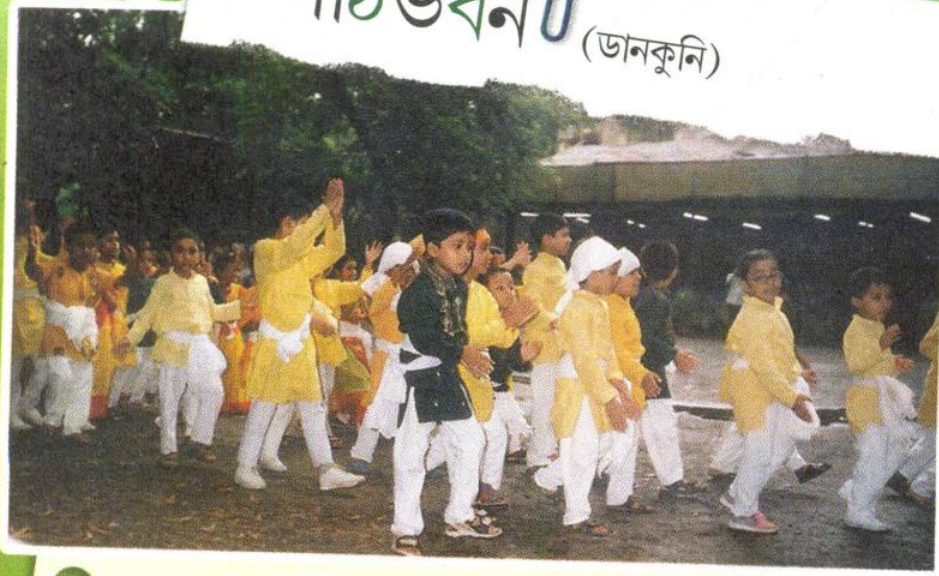

আমাদের স্কুল

রবীন্দ্র ভাবধারার অনুসারী আমাদের এই স্কুল তৈরি হয় ১৯৯২ সালে। সহ-শিক্ষামূলক এই প্রতিষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গীত, নৃত্য, খেলাধুলো এবং শিল্পকলাকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত এখানে কোনও রকম পরীক্ষা নেওয়া হয় না। শিশুবিভাগে পড়াশোনা হয় সম্পূর্ণ খেলার আঙ্গিকে। তাই এই স্কুলের শিশুরা শৈশবের অনাবিল আনন্দের স্বাদ নিতে পারে।

ফুলের নামে শ্রেণিকক্ষের নাম

বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের নামেও রয়েছে বৈচিত্র, বিভিন্ন ফুলের নামে নামকরণ করা হয়েছে শ্রেণিকক্ষের। যেমন, শিউলি, শিরীষ, পলাশ, পারিজাত, কুন্দ, বকুল, রঙ্গন প্রভৃতি। আমাদের শেখানো হয় যে, আমরা সকলে ফুলের মতো সুন্দর আর নিষ্পাপ, তাই আমাদের শ্রেণিকক্ষও ফুলের মতো পবিত্র! শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক বন্ধুর মতো, আমরা তাঁদের ভয় পাই না, তাঁদের ভালবাসি এবং শ্রদ্ধা করি।

বর্ষামঙ্গল উৎসব

দারুণ উদ্দীপনার সঙ্গে আমরা প্রতি বছর বৃক্ষরোপণ এবং বর্ষামঙ্গল উৎসব পালন করি। ১০ অগস্ট এই অনুষ্ঠান হয়। দৃষ্টিনন্দন এই অনুষ্ঠান দেখতে অনেক দূর থেকেও মানুষজন আসেন। সুসজ্জিত পালকিতে করে একটি চারাগাছ নিয়ে আসা হয় উৎসব-প্রাঙ্গণে। সঙ্গে চলে গান 'মরুবিজয়ের কেতন ওড়াও'! বর্ষাকালে এই অনুষ্ঠানটি হয়, তাই প্রায় প্রতি বছরই এই দিনটিতে বৃষ্টি হয়। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে ভিজে আমরা গান গাই।

মিলনমেলা আনন্দমেলা

প্রতি চার বছর অন্তর পাঠভবনে এই অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই মেলায় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করা বিভিন্ন হস্তশিল্পের প্রদর্শনী তো থাকেই, এর সঙ্গে থাকে জিভে জল আনা 'ফুড পার্ক'! এই মেলা-প্রাঙ্গণেই আয়োজন করা হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে তিন-চারদিন ধরে চলা এই মেলায় শুধুই মজা, মজা আর মজা!

এই বিদ্যালয় আমাদের কাছে শুধুমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই নয়, 'পাঠভবন' আমাদের এগিয়ে চলার পথে এক উজ্জ্বল আলোকশিখা!

অমৃতা ভৌমিক *পঞ্চম শ্রেণি/বকুল*

ঘোষণা

নিজেদের স্কুলকে দেখতে চাও 'আনন্দমেলা'র ক্যাম্পাসের পাতায়? তা হলে ৪০০ শব্দের মধ্যে লিখে পাঠাও আমাদের দপ্তরে, সঙ্গে ভাল রঙিন ফোটো পাঠিও কিন্তু! লেখাটি স্কুলের প্রধানকে দিয়ে প্রত্যয়িত করে নিতে ভুলো না। আমাদের ঠিকানা:

আনন্দমেলা
ক্যাম্পাস বিভাগ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১

কানামাছি

তুষারকান্তি ভট্টাচার্য

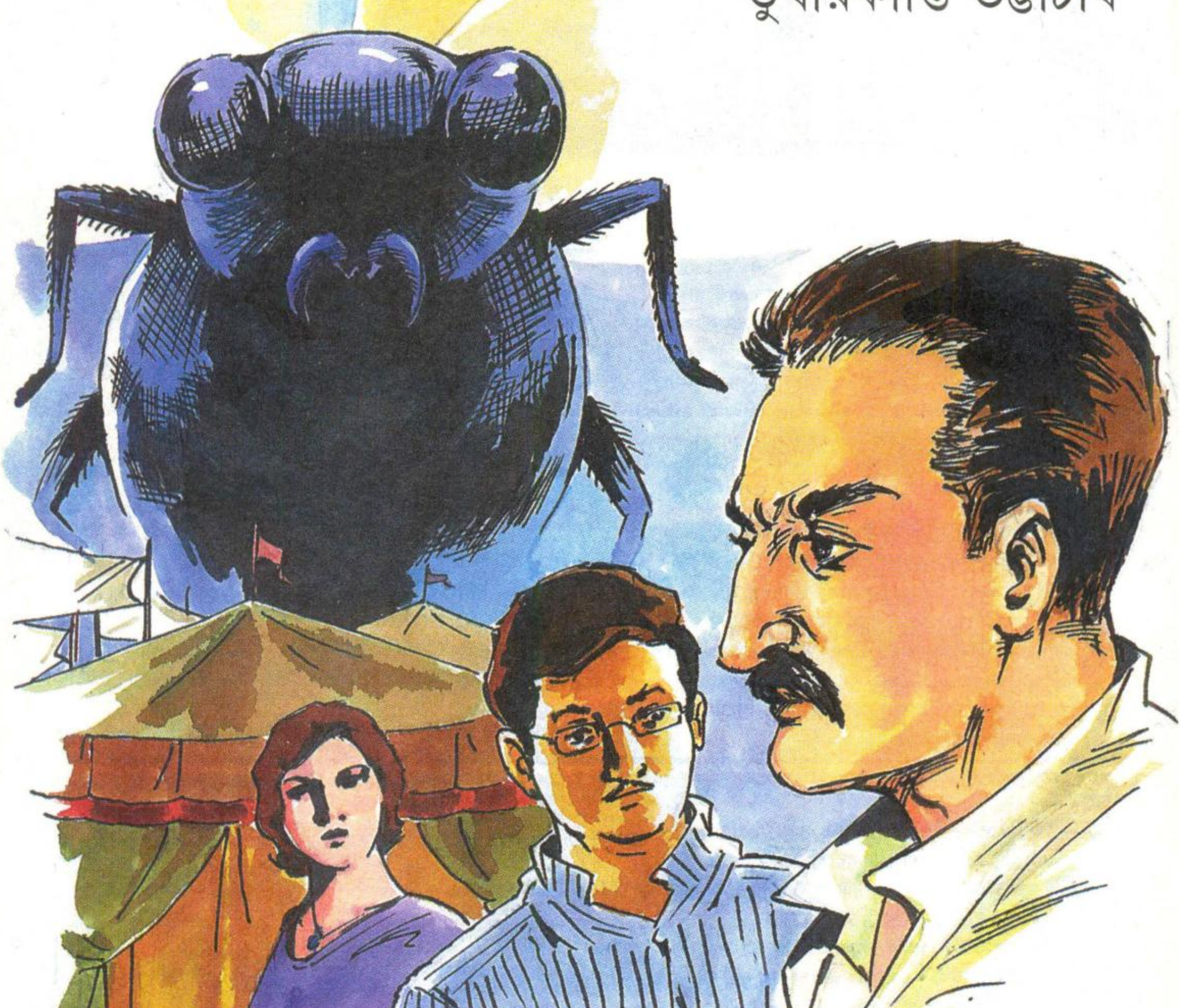

ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

আগে যা ঘটেছে: কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে যে 'মার্ভেলাস সার্কাস' চলছে, হঠাৎ একদিন সেই সার্কাস দলের দু'টো চিতা আর দু'টো রয়াল বেঙ্গল টাইগার মারা গেল। পরের দিন মারা গেল আরও দু'টো চিতা। সার্কাসের প্রোপ্রাইটার মিস বিউটি নায়ারের রাতের ঘুম ছুটে গেল। পুলিশের সাহায্যের জন্য ছুটে গেলেন লালবাজারে। ডিসি ডিডি ওয়ান অনুজ মিত্রের সঙ্গে কথা বললেন বিউটি নায়ার। তদন্ত শুরু হয়ে গেল। কিন্তু বিউটি নায়ারের মনে খটকা লাগল, এ কোনও গুপ্তহত্যা নয় তো? কেউ কি হত্যা করল বাঘগুলোকে? গোবিন্দচন্দ্র গায়েন আর তাঁর সহকারী ব্রীড়াবরণ বটব্যালের আশ্চর্য সব কাণ্ডকারখানায় অবাক হয়ে গেলেন সকলে। এরপর...

ডিসি অনুজ মিত্র, জিজি এবং ব্রীড়াকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন মার্ভেলাস সার্কাসের তাঁবুতে। ঘড়িতে তখন বারোটা দশ। অনুপম চ্যাটার্জি তাঁর তদন্তকারী টিম নিয়ে ডিসির নির্দেশমতো আগেই পৌঁছে গিয়েছেন। বিউটি নায়ার এগিয়ে এসে ওঁদের অভ্যর্থনা জানালেন।

জিজি অসুস্থ চিতা এবং বাঘেদের দেখতে চাইলেন। বিউটি পথ দেখিয়ে ওঁদের নিয়ে হাজির হলেন হিংস্র জন্তুর জায়গায়। চিতার ফেন্সিংয়ের কাছে এসে জিজি দেখলেন, আটটি চিতা ঘুমিয়ে আছে। বিউটি বললেন, "এদের মধ্যে চারটি খুবই অসুস্থ। দু' দিন হল কিছু খাচ্ছে না। এমনকী জলও স্পর্শ করছে না।"

কথায়-কথায় জিজি জেনে নিলেন, মোট বারোটি চিতা ছিল। তার মধ্যে চারটি মারা গিয়েছে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে। ওদিকে দু'টো বাঘও মারা গিয়েছে প্রায় একই সঙ্গে। ওদের মধ্যেও বেশ ক'টি অসুস্থ।

"আর সিংহ?"

জিজির এই প্রশ্নে বিউটি বললেন, "একটি খুবই অসুস্থ ছিল চার দিন আগেও। এখন সেটি উঠছে, বসছে, খাবারও খেয়েছে।"

"খুব বাসি খাবার কি এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে?"

এর উত্তর বিউটি সরাসরি না দিয়ে দুলাল বলে একজনকে কাছে ডাকলেন। বছর পঁয়ত্রিশের দুলাল কাছে এসে নমস্কার করল। সে জানাল, "দিনে একবারই খাবার দেওয়া হয় এবং তা টাটকা।"

এই কথা শুনে ডিসি বললেন, "মিঃ গায়েন, পোস্টমর্টেম রিপোর্টে ফুড পয়জনিংয়ের ব্যাপারে নেগেটিভ বলা হয়েছে। স্টমাক কনটেন্ট-এর কেমিক্যাল রিপোর্টও তাই। এই জন্যেই কোনও সূত্র ধরে এগনো মুশকিল হচ্ছে।"

দুলালের পিছনে একটি বিশ-বাইশ বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে চুপচাপ শুনছিল। তাকে দেখতে পেয়ে জিজি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে?"

সে উত্তর দেওয়ার আগেই দুলাল বলল, "ওর নাম নিতাই। আমরা দু'জনেই খাবার দিই।" কোন চিতাগুলো অসুস্থ তা দুলালই চিনিয়ে দিল তর্জনী দেখিয়ে।

জিজি ফেন্সিংয়ের ধারে হুমড়ি খেয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ চিতাগুলোকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর হঠাৎ তর্জনী ঠোঁটের উপর চেপে অদ্ভুত কৌশলে তুললেন এক শব্দতরঙ্গ, দু'বার, তিনবার। তিনটি ছাড়া সব চিতার ঘুম টুটে গেল। উঠে বসে অপূর্ব ভঙ্গিমায় চার পাশ দেখছে ওরা। হয়তো খুঁজছে সেই শব্দতরঙ্গের উৎস।

একই কৌশলে আরও দু'বার ওই শব্দ করতেই পাঁচটি চিতা রাজকীয় ভঙ্গিমায় উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় ছুটতে-ছুটতে চলে এল জিজির কাছে। শব্দতরঙ্গের সামান্য হেরফের ঘটাতেই সকলে ভয়ে শিউরে উঠল। কারণ, ওরা সকলে জিজির গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে। মাঝে শুধু মোটা রেলিংয়ের ব্যবধান। ওদিকে জিজি কিন্তু অনড়। শুধু কি তাই? দু'টো হাতই গলিয়ে দিয়েছেন ভিতরে।

তা দেখেই ডিসি প্রায় চিৎকার করে বললেন, "এ কী করছেন, মিঃ গায়েন?"

খুবই নির্লিপ্তভাবে জিজি সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে ডিসিকে ইঙ্গিতে চুপ করতে বললেন। ব্রীড়াও ডিসির কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললেন, "চুপচাপ দেখে যান স্যার।"

অনুপম চ্যাটার্জি উত্তেজনায় তাঁর নাইন এম এম আগ্নেয়াস্ত্রের খাপে হাত রেখেছেন। বিউটি নায়ার বিস্ফারিত চোখে দেখছেন জিজির কাণ্ডকারখানা। হাত দু'টো ছিঁড়ে নেবে না তো!

ওদিকে চিতাগুলো কেমন সুরেলা স্বরে পিকপিক করছে আর জিজির হাত চাটছে। কত যুগ পরে যেন দেখা! সেই কবে আফ্রিকার জঙ্গলে শেষ দেখা। তারপর আজ! যেন ওরা হাবেভাবে বলতে চাইছে, এত দিন কোথায় ছিলে জিজি? কেমন আছ?

অনুজ মিত্র প্রাথমিক উত্তেজনা কাটিয়ে ভাবছিলেন অন্য কথা। সমস্ত হিংস্রতা কোন মন্ত্রবলে এভাবে বশ্যতা স্বীকার করছে! বন্দুক-পিস্তলের দম্ভ তা হলে কি অন্তঃসারশূন্য? শব্দব্রহ্মই আসলে বিপুল শক্তির উৎস? স্নেহমমতা মাখা শব্দের এত শক্তি? না! লোকটার কেরামতি আছে বলতেই হবে।

বিউটি ভাবছিলেন যদি কেউ পারেন তো এই জিজিই পারবেন। অথচ একটু আগে ডিসিসাহেব যখন ওঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বললেন, "ইনি মিঃ গোবিন্দ গায়েন, মানে জিজি," তখন বিউটির মনে হয়েছিল, এই সাদামাঠা লোকটা করবে চিতার মৃত্যুতদন্ত? যত্ত সব! এই মুহূর্তে সেই ধারণাটাই গেল পালটে। না, সত্যিই এলেমদার। জানেন অনেক কিছু।

ফের কী যেন শব্দ করলেন। অমনই সেই পাঁচটি চিতা ফিরে গেল আগের জায়গায়। এবার জিজি চোখ বুজে কিছু যেন ভাবলেন। হয়তো অনেক দিনের অনভ্যাসে ভুলে গিয়েছেন কিছু কৌশল। মাত্র আট-দশ সেকেন্ড। তারপর গাল ফুলিয়ে বুড়ো আঙুল ঠোঁটে চেপে সৃষ্টি করলেন তীব্র সুরেলা স্বর। কেঁপে-কেঁপে সেই স্বরধ্বনি মোহিত করল উপস্থিত সকলকে। এবং আশ্চর্য, তিনটি অসুস্থ চিতার কান নড়ে উঠল প্রথমে। তারপর বেশ

অনিচ্ছায় ঘাড় তুলল। এক সময় উঠেও দাঁড়াল সবক'টি।

জিজি কিন্তু ক্রমাগত সেই একই সুরে শব্দের কম্পন বজায় রেখেছেন। ওই তিনটি চিতা দিক ঠিক করে প্রতি পদক্ষেপে ক্লান্তির ছাপ ফুটিয়ে জিজির সামনে হাজির হল। ঘুমে যেন চোখ শুধুই জুড়ে আসছে। শত চেষ্টা করেও ওরা চোখ খুলে রাখতে পারছে না। জিজি একইভাবে হাত বাড়ালেন ভিতরে। এক-দু'বার জিভ বের করেও চাটতে পারছে না জিজির হাত। যেন ওরা বলতে চায়, কেন খামোকা ঘুম ভাঙালে?

জিজি কিন্তু সময় নষ্ট না করে ডান হাত দিয়ে ওদের কান ধরলেন আলতো মুঠোয়। কারণ, পশুর নাড়ি কানেই। এই সময় জিজির চোখে জল এসে গেল ওদের দুঃখে। তারপরেই যেন চাপা হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "যে বা যারা তোমাদের এই হাল করেছে, তাদের আমি ছাড়ব না, কিছুতেই না। তোমাদের অসুখ আমি ধরে ফেলেছি। যাও, ঘুমোতে যাও। ভয় নেই।"

অনুপম চ্যাটার্জিও জিজির কাণ্ড দেখে অভিভূত। কিন্তু জিজি যখন ওদের অভয় দিয়ে বলছেন, 'যাও, ভয় নেই,' তখন হাসিই পেল। যে চিতাদের ভয়ে হরিণ, জেব্রা, খরগোশ, এমনকী মানুষও তটস্থ, সেই শক্তিধর হিংস্র চিতাকে জিজি বলছেন, ভয় নেই! কে কাকে ভয় পায়?

চারটি নয়, তিনটি অসুস্থ চিতা কিন্তু তাদের জায়গায় ফিরে যেতে পারল না। ফেন্সিংয়ের ধারেই চিত হয়ে পড়ে গেল এবং সেই একই ভঙ্গিতে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল অচিরেই।

জিজি বেশ চিন্তিত স্বরে বিউটিকে বললেন, "এই তিনটি অসুস্থ চিতাকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিন। আর পশুচিকিৎসক কে আছেন, তাঁকে একটু ডাকুন।"

বিউটি দুলালকে পাঠালেন ডাঃ অশোক সানাকে ডাকতে। তিনি কাছেই ছিলেন। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। জিজি অসুস্থ বাঘ এবং চিতাগুলোর চিকিৎসার বিষয়ে জেনে নিয়ে বললেন, "আপনার উপর খবরদারি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। একটাই অনুরোধ, মাল্টি ভিটামিন ইঞ্জেকশন শুরু করুন। স্যালাইন চলুক আর এই গভীর ঘুম কাটানোর কোনও অ্যান্টিডোট যদি কিছু থাকে তো শিগ্‌গির প্রয়োগ করুন। আর ম্যাডাম...।"

বিউটি কাছে এলেন, "ইয়েস, মিঃ গায়েন।"

"যত তাড়াতাড়ি পারেন প্রাণীগুলোর এরিয়ায় ডিডিটি, গ্যামাক্সিন এবং ডিসইনফ্যাকট্যান্ট স্প্রে শুরু করুন। এটা ওয়ার ফুটিংয়ে হওয়া দরকার। নইলে বাকি পশুগুলোকে বাঁচানো মুশকিল হয়ে পড়বে।"

বিউটি ম্যানেজার মিঃ কপূরকে ডেকে পাঠিয়ে সেইমতো নির্দেশ দিলেন।

ডিসি বেশ মন দিয়ে জিজির কাজ দেখছিলেন। ইচ্ছে ছিল না নড়ার। কিন্তু একটি আর্জেন্ট কল পেয়ে সেলফোন পকেটে ভরে জিজির কাছে আপাতত বিদায় নিয়ে লালবাজার ফিরে গেলেন।

জিজি একে-একে বাঘ-সিংহের খাঁচাও দেখলেন। ইতিমধ্যে বিপুল উদ্যমে ডিডিটি স্প্রে শুরু করা হয়েছে। বেশ কড়া ঝাঁঝ। জিজি এটাই চাইছিলেন। এক সময় বিউটিকে বললেন, "ম্যাডাম, কোথাও একটু বসা দরকার।"

বিউটি খুবই ব্যস্তভাবে ওদের গেস্ট লাউঞ্জে নিয়ে চললেন। এই সময় অনুপম চ্যাটার্জির সেলফোন বেজে উঠল। তাঁকেও এখনই থানায় ফিরতে হবে। খুবই জরুরি। জিজি রাজি হলেন।

প্রথমেই সার্কাসের পুরুষ প্লেয়ারদের তাঁবুর সারি। নম্বর সাঁটা রয়েছে সব তাঁবুর দরজায়। ব্যবস্থা ভারী সুন্দর। ওদের যাওয়ার পথে সতেরো নং তাঁবু থেকে জোর হাসির শব্দ ভেসে এল। জিজি একটু থমকে দাঁড়ালেন। 'বিক্রম আয়ার' লেখাটি জ্বলজ্বল করছে। দু'-চারটি কথা, সম্ভবত সেলফোনের কথাবার্তা ভেসে এল, 'আরে ছোড়ো ইয়ার।' বলেই আর-এক দফা হাসি। জিজির ভ্রূ কুঞ্চিত। টিমের এই দুর্দিনে এত হাসিও পাচ্ছে তা হলে! তার পরেই দ্রুত পায়ে এগোলেন লাউঞ্জের দিকে।

গেস্ট লাউঞ্জ সুন্দর করে সাজানো। মনেই হয় না তাঁবুর ভিতরেই এই সুব্যবস্থা। আরামদায়ক সোফায় বসেই জিজি বললেন, "ম্যাডাম, আমি কিন্তু আপনার প্রিয় চিতা বা বাঘগুলোর মূল অসুখটা বোধ হয় ধরতে পেরেছি। কিন্তু একটা খটকা লাগছে, এই রোগের এজেন্ট ভারতের জঙ্গলে দুর্লভ। তা হলে প্রশ্ন উঠছে, আপনার এমন কে জাতশত্রু রয়েছে, যে আপনার টিমের ক্ষতি করতে চায়? শুধু তাই নয়। এই হীন কাজটির জন্য অনেক টাকা খরচ করতেও সে বা তারা পিছপা নয়?"

ব্রীড়া জিজির পাশে বসে ডায়েরিতে নোট নিচ্ছিলেন। বিউটি নায়ার বেশ প্রত্যয়ের সুরে বললেন, "শত্রু যদি কেউ থেকে থাকে তো ওই মেট্রোপলিস সার্কাস। ওরা হিংসার বশে তা হলে কোনও গুপ্তঘাতক লাগিয়েছে।"

কিছুক্ষণ গুম হয়ে জিজি কিছু ভাবলেন। "হ্যাঁ বিষয়টি অবশ্যই উড়িয়ে দেওয়ার নয়। হিংসা মানুষকে বিষধর সাপে পরিণত করে। কিন্তু ম্যাডাম, তা করতে গেলে মেট্রোপলিস সার্কাস কর্তৃপক্ষকে এমন লোক বেছে নিতে হবে, যে এই মার্ভেলাস সার্কাস দলের সদস্য। যে ওই প্রাণীগুলোর কাছাকাছি যেতে পারে হুটহাট, অথচ কেউ সন্দেহ করবে না।"

বিউটির কাছে জিজির বক্তব্য বেশ যুক্তিপূর্ণ মনে হল। তা লক্ষ করে জিজি বললেন, "কিছু মনে করবেন না মিস নায়ার। বলছিলাম কী, সিনিয়র সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন পদ নিয়ে তো রেষারেষি...।"

"তা যদি বলেন, তবে...।"

বিউটির কথার খেই ধরে প্রায় ছোঁ মেরে জিজি জানতে চান, "বলুন, বলুন!"

"আসলে ব্যাপারটি একান্তই ব্যক্তিগত। তবে তদন্তের খাতিরে তা বলতে আমার অসুবিধে নেই।" বলেই বিউটি বেশ লাজুক ভঙ্গিতে বাকিটুকু শেষ করলেন, "রাজেশ, মানে রাজেশ আপাং আর বিক্রম আয়ার, ওদের মধ্যে কথাবার্তা নেই। ওদের মধ্যে প্রচণ্ড রেষারেষি।"

জিজি কিছুটা আন্দাজ করতে পারছেন। তাই সংশয় কাটাতে জিজ্ঞেস করলেন, "ওদের দ্বন্দ্ব কি আপনাকে নিয়ে?"

"হ্যাঁ।"

ব্রীড়া, রাজেশ আপাং এবং বিক্রম আয়ার দু'জনের নামই ডায়েরির পাতায় লিখে নিলেন। জিজি এবার প্রসঙ্গ পালটে জানতে চাইলেন, "ম্যাডাম, জন্তুদের খেলার রিংমাস্টার কে?"

"হেড রিংমাস্টার প্রভুরঞ্জন রাও। উনি বাঘ, সিংহ, চিতা এবং

হায়েনার ট্রেনারও। গত মাস থেকে, মানে আমরা যখন ভুবনেশ্বরে, তখন থেকে ওঁর মেয়ে পামেলা অ্যানিম্যালসের খেলাগুলো দেখাচ্ছে। আসলে আমিও চাই হিংস্র জন্তুদের খেলা মেয়েদের হাতেই থাক। তাতে খেলাগুলো বেশ আর্কষক হয়ে ওঠে।"

পামেলার কথা শুনে জিজি কিছু বলতে যাবেন, এমন সময় বলা নেই, কওয়া নেই, চল্লিশ ছুঁইছুঁই এক দীর্ঘদেহী নিকষ কালো মানুষ লম্বা পা ফেলে সটান ঢুকে পড়লেন লাউঞ্জে। তাঁকে দেখেই বিউটি প্রায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। মলয়ালম ভাষায় তাঁকে যথেষ্ট তিরস্কারও করলেন।

সেসব কর্ণপাত না করে তিনি বললেন, "আসল রিংমাস্টার আমি। ওই রাও ঠগ। বিউটিকে ধাপ্পা দিয়ে বলেছেন, উনি মাঞ্চুরিয়ান সার্কাসে ছিলেন। ওঁরা বাপ-বেটি বিউটিকে তুক করেছেন। রিংমাস্টারের হান্টার আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছেন।"

জিজি কিন্তু খুবই নির্লিপ্ত, "আপনি?"

"অ্যালেক্স কোশি। বিউটির সার্কাসে দশ বছর আছি। আর প্রভুরঞ্জন মাত্র চার বছর।"

ব্রীড়া জিজ্ঞেস করলেন, "স্যার, প্রভু রাওকে কি ডেকে পাঠাব?"

জিজি হাত তুলে নিষেধ করলেন। তাঁর ইচ্ছে ওই প্রভু রাও এবং পামেলাকে আলাদাভাবে মিট করবেন। কারণ, এই যুদ্ধংদেহি মানুষটি হাতাহাতি করতেও পিছপা নন।

এদিকে বিউটি তাঁকে বারবার বলছেন, "কোশি, এখন যাও। পরে সব কথা শোনা হবে।"

জিজিও বেশ মার্জিতভাবে ওঁকে চলে যেতে বললেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অ্যালেক্স কোশি লাউঞ্জ ছেড়ে চলে গেলেন।

অ্যালেক্স বিদায় নিতেই জিজি জানতে চাইলেন, "মূল রিংমাস্টারের মাইনে কি এই অ্যালেক্স কোশির মাইনের চেয়ে...?"

কথাটা প্রায় লুফে নিয়ে বিউটি বললেন, "হ্যাঁ, অনেকটাই বেশি। তবে পামেলা রাও সেটা পায় না। পান ওর বাবা প্রভু রাও।"

"কিন্তু, এত দিনের পুরনো সদস্য অ্যালেক্সকে বঞ্চিত করার কারণ?"

"কোশি ভীষণ বদরাগী। প্রাণীগুলোর উপর অযথা টর্চার করে এবং এটা সে করে বেশি বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে। এই তো দু'মাস আগে কানপুরে শো চলার সময় 'ফেরোসাস' নামে চিতাটি কোশির উরুতে জব্বর থাবা বসায়। অথচ নামে ফেরোসাস হলে কী হবে? ও ভীষণ শান্ত।"

"ওই চিতাটি বেঁচে আছে?"

জিজির এই প্রশ্নে বিউটি সোৎসাহে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই তো, যারা আপনার হাত চেটে দিল, তাদেরই একটি হল ফেরোসাস।"

কী মনে করে জিজি দুলাল এবং নিতাইকে ডাকতে বললেন। বিউটির নির্দেশ পেয়ে একজন ছুটল ওদের ডাকতে। ওরা আসতেই জিজি দুলালকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা দুলাল, সাত-আটদিন আগে বাঘ-সিংহ বা চিতাদের খাঁচার কাছে কাউকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখেছ? ভাল করে মনে করে দ্যাখো।"

দুলাল ভাবল কিছুক্ষণ। না, তেমন কিছু তার মনে পড়ছে না। তবে হ্যাঁ, নারান টোপ্পো গত সপ্তাহে সিংহের খাঁচার কাছে বার-দুই যেন উঁকি দিয়েছিল। তবে ওরকম উঁকিঝুঁকি তো অনেক সদস্যই যাওয়াআসার পথে দেয়। সন্দেহ করার কারণ কিছুই নেই।"

জিজি চোরা চোখে লক্ষ করলেন, নিতাই যেন কিছু বলার জন্য উসখুস করছে। অথচ ভরসা পাচ্ছে না। সে কি দুলালকে ভয় পায়? কী ভেবে জিজি ওদের চলে যেতে বললেন। দরকার হলে নিতাইকে পরে ডাকবেন মনে-মনে ঠিক করলেন। এখন কথা বলা দরকার প্রভু রাওয়ের সঙ্গে। তবে জিজি রাওয়ের তাঁবুতে গিয়েই কথা বলা সমীচীন মনে করলেন।

ওঁরা যখন প্রভু রাওয়ের এগারো নম্বর তাঁবুর দিকে এগোচ্ছেন, উলটো দিক থেকে এক সুপুরুষ যুবক বারমুডা পরা, খোশ মেজাজে গুনগুন করে সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে এদিকে আসছেন। বিউটিকে দেখে আকর্ণ হেসে উইশ করে এগিয়ে যেতেই জিজি জানতে চাইলেন, "ইনি?"

"রাজেশ আপাং। জাগলিং এবং জিপ জাম্পিংয়ের খেলা দেখায়।"

"আর ওই নারায়ণ বা নারান টোপ্পো?"

"সিনিয়র জোকার এবং প্রায় সব ব্যালান্সের খেলার ট্রেনার।"

প্রভু রাওয়ের তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে বিউটি, "আঙ্কল, আঙ্কল" বলে দু'বার ডাক দিতেই পঞ্চাশোর্ধ সুঠামদেহী প্রভু রাও বেরিয়ে এসে সকলকে ভিতরে আহ্বান জানালেন। ভিতর বলতে বেডরুম নয়। প্রত্যেক সিনিয়র সদস্যের একটা গেস্ট তাঁবু রয়েছে। ওঁরা সেইখানেই বসলেন।

প্রভু রাও মানুষটি সাদাসিধেই মনে হল। পামেলাও এল এক সময়। জিজি লক্ষ করলেন, বিউটির অগাধ আস্থা এই প্রভু রাওয়ের উপর। তবুও ওঁর মনে হল, এই আস্থার সুযোগ নিয়ে গোটা সার্কাস দলের উপরই কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চান রাও। মেয়েকে এত হিংস্র প্রাণীর দায়িত্ব পাইয়ে দিয়েছেন। নিজে সিনিয়র রিংমাস্টার। অথচ অ্যালেক্স কোশি কত পুরনো সদস্য। শুধু বদমেজাজটাই কি একমাত্র ডিসকোয়ালিফিকেশন?

প্রভু রাও কথায়-কথায় জানালেন, তিনি মাঞ্চুরিয়ান সার্কাস দলে প্রায় সাতাশ বছর কাটিয়েছেন। হিংস্র জন্তুদের বেত বা হান্টার ছাড়াই শুধু স্নেহমমতা দিয়েই বশ করতে শিখেছেন ওঁর গুরু তান-চুয়ানয়ের কাছে। তিনি অ্যালেক্স কোশিকে ভালবাসেন। কিন্তু বড্ড গোঁয়ার। বেত, হান্টার ছাড়া খাঁচায় ঢোকেন না। যখন-তখন ওদের কান ধরে, সিংহের কেশর খামচে শাসন করেন। এক দিন তো ওঁর জোব্বার পকেটে ট্রাংকুলাইজার সিরিঞ্জও পাওয়া গিয়েছে। প্রাণীগুলো বেয়াদপি করলে ওদের শরীরে সিরিঞ্জের নিড্‌ল পুশ করে ঘুমপাড়ানি ওষুধ দিতেন। পামেলাই প্রথম এটা দেখে ফ্যালে। বিউটিকে রিপোর্ট করতেই, তিনি কোশিকে খাঁচার কাছে যাওয়া বন্ধ করে দেন।

বিউটিও সেই কথা জানালেন। ডিডিটির কড়া গন্ধ এখানে বসেও টের পাওয়া যাচ্ছে। প্রভু রাও প্রসঙ্গক্রমে বললেন, তিনিও ওষুধ স্প্রে করার কথা ক'দিন আগে বলেছিলেন। কেউ তেমন গুরুত্ব দেয়নি। আসলে জন্তুদের ইনসেক্টের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা খুবই জরুরি।

একথা শুনে জিজি মাথা দুলিয়ে সমর্থন করলেন।

প্রভু রাওয়ের তাঁবু থেকে বের হয়ে জিজি ফের একবার প্রাণীগুলোকে দেখতে চাইলেন। তাই শর্টকাট অন্য প্যাসেজ দিয়ে বিউটি ওঁদের পথ দেখিয়ে চললেন। কিছুটা এগিয়ে জিজি একটু দাঁড়ালেন। বিউটিকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "ম্যাডাম, কিছু মনে করবেন না, আপনার এই আঙ্কল প্রভু রাও সত্যি-সত্যি কি ডিডিটি স্প্রে করার কথা বলেছিলেন?"

বিউটি একটু ভাবার চেষ্টা করে বললেন, "হয়তো ম্যানেজার মিঃ কপূরকে বলে থাকতে পারেন। আমাকে ডাইরেক্টলি অবশ্য বলেননি। কেন বলুন তো?"

"না এমনই। আচ্ছা, ম্যানেজার মিঃ কপূরের সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার যে!"

"বেশ তো, চলুন না। এখন তো জন্তুদের ফেন্সিংয়েই যাচ্ছি আমরা। ওখান থেকেই ডেকে পাঠাব।"

ওঁরা এখন ফিমেল এনক্লেভ দিয়ে চলেছেন। বেশ কয়েক স্টেপ এগিয়েছেন, এমন সময় সেভেন-এফ নাম্বার তাঁবু থেকে একটি তেরো-চোদ্দো বছরের মেয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল। কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছে বোঝা গেল। বিউটি দ্রুত পায়ে ওর কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন, "সারিকা, বাত কেয়া? ইতনি ঘাবড়াতি কিঁউ?"

"ম্যাডাম, কক্রোচ! বহোত জিদ্দি।"

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে একজন মধ্যবয়স্কা মহিলাও বের হলেন একই তাঁবু থেকে। তাঁরও চোখে-মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ। বিউটি তাঁর কাছেও জানতে চাইলেন, "আরতিজি? আপকি বিটি কক্রোচ সে বহোত ডরতে হ্যায়?"

"নেহি ম্যাডাম। ইয়ে কক্রোচ নেহি।"

"তব?"

ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনীর সাহায্যে একটা মাপ বুঝিয়ে আরতি বললেন, "ফ্লাই... জায়ান্ট সাইজ। ...অ্যাইসা!"

ফ্লাই এবং জায়ান্ট সাইজ কথাগুলো কানে আসতেই জিজি অন্যমনস্কতা কাটিয়ে প্রায় ক্যাঙারু-লাফে আরতির মুখোমুখি হলেন, "কোথায়? হোয়ার ইট ইজ? দ্য ফ্লাই?"

শুধু বিউটি নায়ারই নন, নিত্যসহচর ব্রীড়াও বেশ অবাকই হলেন জিজির এই দৃষ্টিকটু তৎপরতায়। জিজির ওসবে ভ্রুক্ষেপ নেই। হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়লেন আরতির তাঁবুতে। সারিকা এবং তার মা ভয়ে-ভয়ে জিজির পিছু-পিছু ভিতরে উঁকি দিয়ে বললেন, "উধার।"

ওঁরা যেদিকে নির্দেশ করলেন সেই ক্যাম্বিলের দেওয়াল তখন শূন্য। জিজির সর্তক দৃষ্টি শক্তিশালী টর্চের মতো চার পাশ দেখে নিচ্ছে। বেশি খুঁজতে হল না। অচিরেই দেখা পাওয়া গেল সেই বিকটদর্শন ফ্লাইয়ের। রংটা ধূসর। তার উপর আলতো বাদামি রঙের প্রলেপ। গ্রামেগঞ্জে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে যে ঝিঁঝিপোকার দেখা পাওয়া যায়, অনেকটা সেই রকম দেখতে বা বলা যেতে পারে, বেশ বড় সাইজের ডাঁশ।

ক্ষিপ্র হাতে টেবিলে পড়ে থাকা একটি ম্যাগাজিন তুলে রোল করে জিজি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন মাছিটার উপর। হঠাৎ কী ভেবে থেমে গেলেন। না মেরে, ওটাকে ধরে ফেললে কেমন হয়? প্রথমেই চাইলেন একটি তোয়ালে। সারিকা বালিশের উপর পড়ে থাকা তোয়ালে এগিয়ে দিল। পরক্ষণেই ভাবলেন ওটাকে গ্লাভ্সের মতো ঢেকে মাছিটাকে ধরবেন। কিন্তু যদি কামড়ে দেয়! তাই ওঁদের বললেন সিঙ্গল নেটের মশারি দিতে। কাছেই ছিল। সেটি নিয়ে জিজি ব্রীড়াকে কাছে ডেকে এক দিক ধরতে নির্দেশ দিলেন, ঠিক যেভাবে ধীবরেরা মাছ ধরে। মাছ না ধরে ওঁরা ধরবেন মাছি।

বাতাসের কম্পনে অতিসংবেদনশীল, মাছিটি কিন্তু ইতিমধ্যে দু'-তিনবার জায়গা বদল করেছে। যেই ওটি কিছুটা নাগালের মধ্যে দেওয়ালে ফের বসেছে, ওঁরা খুব তাড়াতাড়ি বেশ কিছুটা দূরত্ব থেকে মশারিটি মেলে ধরে খুব সাবধানে আরও একটু এগোতেই সে দেওয়াল ছেড়ে উড়ে পালাতে গেল। কিন্তু এবার সে আর গলে যেতে পারল না। মশারি-বন্দি হয়ে খুব গর্জন করতে লাগল বুঁ-উঁ-উঁ করে!

যেন লক্ষ টাকার লটারি জিতেছেন। প্রবল উৎসাহে বিউটিকে বললেন, "ম্যাডাম, এখনই একটা ট্রান্সপারেন্ট প্লাসটিকের কৌটো চাই।"

ওঁরা এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে জিজির কাণ্ডকারখানা লক্ষ করছিলেন। ওটি ধরা পড়তেই সারিকা উৎসাহে হাততালি দিল এবং নিজের বিস্কুটের বয়ামটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, এটা চলবে কিনা।

বয়ামটির ঢাকনা এবং সাদা আস্তরণ দেখেই জিজি বললেন, "খুব চলবে। বিস্কুটগুলো খালি করে নাও।"

বিউটি আরতিকে বললেন, তিনি একটু পরেই নতুন বয়াম পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

জিজির নির্দেশে ব্রীড়া বয়ামটির দু' পাশের দেওয়ালে বেশ কয়েকটি ফুটো করলেন সারিকার কাছ থেকে মাথার ক্লিপ নিয়ে। তারপর খুব সাবধানে খোলা প্লাসটিক বয়ামটি মশারির ভিতর চালান করে পরিসর কমিয়ে এমন কৌশল করলেন জিজি যে, মাছিটি বয়ামের ভিতর ঢুকতে বাধ্যই হল। আর সুযোগ বুঝে ঢাকনার প্যাঁচ ঘুরিয়ে ওটিকে বয়াম-বন্দি করা হল।

এই ডিসেম্বরেও জিজি বেশ ঘেমে উঠেছিলেন। বিউটি ভাবতেই পারছেন না এই মাছিটি ধরতে পেরে জিজি এত খুশি কেন? মেরেই বা দিলেন না কেন?

কী মনে করে জিজি বেশ নরম গলায় বিউটিকে বললেন, "এই মাছির ব্যাপারটি যেন গোপন থাকে, আপনি বিশেষ করে লক্ষ রাখবেন। এদেরও সেই ব্যাপারে সর্তক করে দিন। কারণ, এটা খুবই জরুরি।"

বিউটি আশ্বাস দিলেও মনে-মনে হাসলেন। আচ্ছা পাগল তো! একটা মাছি ধরে মনে করছেন যেন স্বর্গ হাতে পেয়েছেন। লোকটা সত্যি-সত্যি কি তদন্ত করছেন, না মজা করছেন?

ওঁরা সেভেন-এফ তাঁবু থেকে বের হয়ে প্যাসেজে এসে দাঁড়াতেই, জিজি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "ম্যাডাম, তা হলে চলি?"

"তার মানে?" বিউটি নায়ার বিস্মিত। ভদ্রলোক তো আচ্ছা খামখেয়ালি! তবুও বিরক্তি চেপে বললেন, "জন্তুদের ফেন্সিংয়ে যাবেন না?"

জিজি নির্লিপ্ত গলায় বললেন, "না, তার আর দরকার নেই।" একটু পরেই আবার বললেন, "ঠিক আছে, একবার ঘুরেই যাই। আর হ্যাঁ, ম্যাডাম, একটা জিনিস যে এখনই দরকার।"

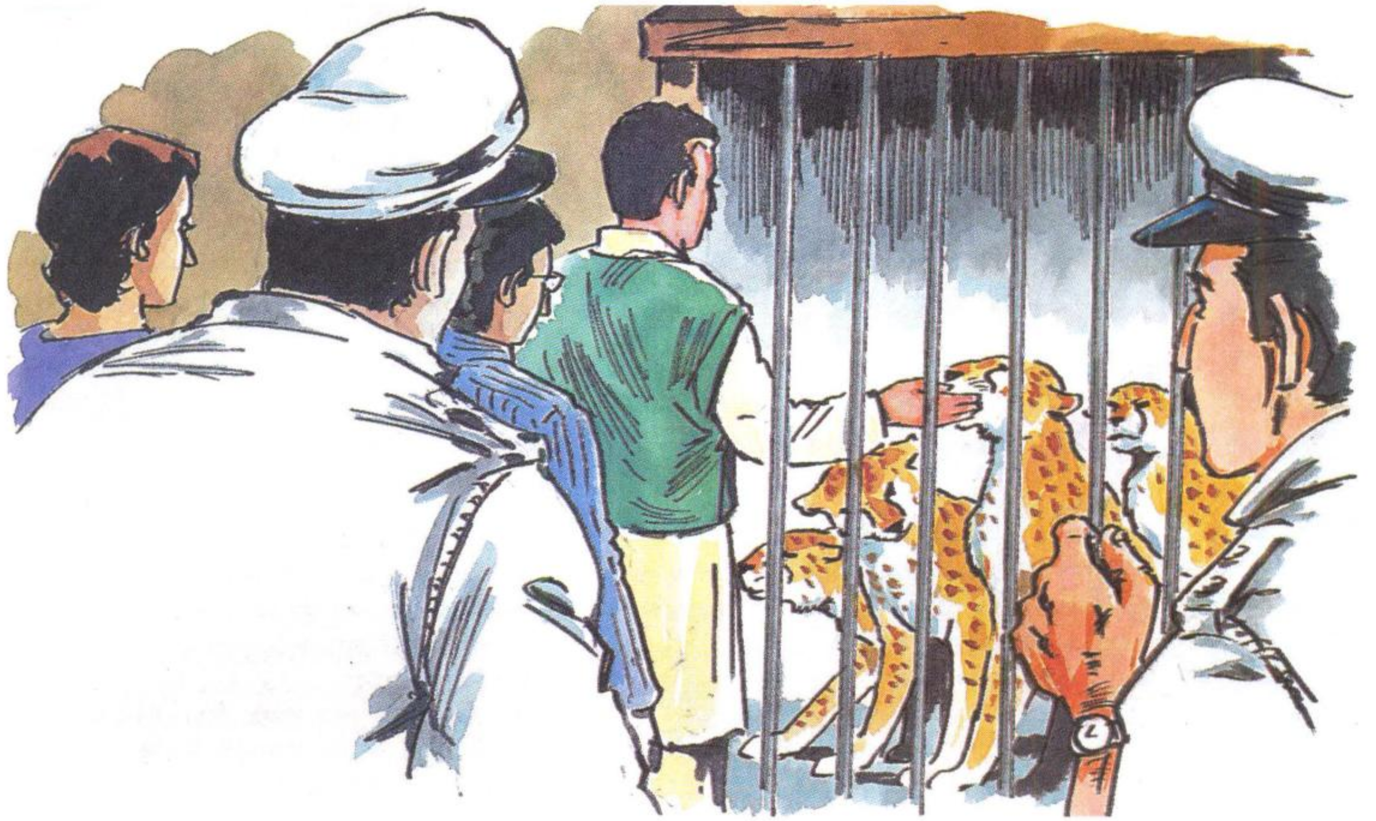

"বলুন না।"

"একটা ক্যারি ব্যাগ। অবশ্যই রঙিন।"

বিউটি একটি সুদৃশ্য হলুদ রঙের ক্যারি ব্যাগ সারিকার কাছ থেকেই জোগাড় করে জিজির হাতে দিলেন। মাছির বয়ামটি তার ভিতর চালান করে জিজি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

অ্যানিম্যালস এনক্লেভ-এ পৌঁছনোর আগেই দূর থেকে জিজির চোখে পড়ল দুলাল এবং নিতাই জন্তুদের টাবে পানীয় জল ঢালছে। ওদের দেখতে পেয়েই জিজি বিউটিকে বললেন, "ম্যাডাম, একটু চালাকির আশ্রয় নিতে হবে।"

"কীরকম?"

"কোনও কাজের বাহানায় দুলালকে কোথাও একটু পাঠাতে হবে। এই দু'-পাঁচ মিনিটের জন্য।"

কাছে পৌঁছেই বিউটি দুলালকে পাঠালেন ম্যানেজার মিঃ কপূরকে ডেকে আনতে। সেই সুযোগে জিজি নিতাইয়ের খুব কাছে গিয়ে কোনও ভণিতা না করে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, "নিতাই, তখন তুমি যেন কিছু বলতে চেয়েছিলে? এখন কেউ কাছে নেই। কিছু বলবে?"

নিতাই চার পাশ দ্রুত জরিপ করে নিয়ে চাপা স্বরে বলল, "এক টুকরো কাঁচা পাঁঠার মাংস চেয়েছিল এক বাবু।"

"কবে?"

কর গুনে হিসেব করে নিতাই বলল, "তা পাঁচ-ছ' দিন আগে।"

"কেন? কেন? কাঁচা মাংসের টুকরো..."

বাবু বলল, "চুহা ধরবে। ওর তাঁবুতে চুহা খুব জ্বালাচ্ছে। ইঁদুর কল আড়বে।"

"তখন দুলাল কাছে ছিল?"

"না।"

"সেই বাবুটির কী নাম?"

"তা জানি না। আমি তো দেড় মাস হল কাজে লেগেছি। দেখলে চিনতে পারব। তবে...।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ বলো।"

"বাবু মনে হয় বেশ কিছুদিন ছুটিতে ছিল। আট-দশ দিন হল তেনাকে দেখছি।"

দুলাল এবং মিঃ কপূর দ্রুত পায়ে আসছেন দেখে জিজি নিতাইয়ের কাছ থেকে সরে হায়েনার খাঁচায় চোখ রাখলেন।

মিঃ কপূর বিউটির দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে বিউটি বললেন, "ওই, উনি বোধ হয় কিছু জিজ্ঞেস করবেন।"

ইতিমধ্যে জিজিও এগিয়ে এসেছেন। মিঃ কপূরকে দেখে জিজির দু'টো কথা মনে পড়ে গেল। জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা মিঃ কপূর, প্রভু রাও আপনাকে ডিডিটি বা গ্যামাক্সিন স্প্রে করার কথা বলেছিলেন? মানে চিতা বা বাঘের মরে যাওয়ার দু'-একদিন পর?"

মিঃ কপূর একটু মনে করে বললেন, "হ্যাঁ, বলেছিলেন বটে।"

বিউটি একটু রুক্ষ মেজাজে বললেন, "তা হলে স্প্রে করা হয়নি কেন?"

জিজিরও একই প্রশ্ন।

মিঃ কপূর বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন, "আমি তো দয়ারামকে বলেও ছিলাম। আসলে সেই ক'টা দিন তো পোস্টমর্টেম করানোর জন্য মৃত চিতাগুলো নিয়ে আমাকেই জু'তে ছোটাছুটি করতে হয়েছিল।"

বিউটি কিছুটা নরম হলেন। বললেন, "পরে দয়ারামকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন?"

"অবশ্যই। দয়ারাম বলেছে কিছু-কিছু মেম্বার বারণ করেছেন। কড়া গন্ধে তাঁদের অসুবিধে হবে। তাই সে করেনি। তবে কে বা কারা নিষেধ করেছেন, তা অবশ্য জিজ্ঞেস করিনি।"

শুনে জিজি বললেন, "ঠিক আছে। দয়ারামকে পরে জিজ্ঞেস করা যাবে। আচ্ছা মিঃ কপূর?"

"ইয়েস।"

"ক'জন মেম্বার দীর্ঘ ছুটিতে ছিলেন?"

"চারজন।"

"তাঁদের মধ্যে কতজন ফিরেছেন? এবং কবে?"

"এগ্‌জাক্ট ডেট বলতে গেলে রেজিস্টার দেখতে হবে। আনছি।" বলেই ম্যানেজার মিঃ কপূর দপ্তরের দিকে পা বাড়াতে যাবেন, হঠাৎ জিজির মনে পড়ে গেল একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা।

"ওয়েল মিঃ কপূর। ওয়ান মিনিট।"

"হ্যাঁ, বলুন।"

"প্লেয়ারদের তাঁবুর ভিতর ইঁদুরের খুব উপদ্রব বুঝি?"

"ইঁদুর? আই মিন র‍্যাট?" কপূর যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

"ইয়েস।" জিজির কৌতূহল।

"এখনও পর্যন্ত নো কমপ্লেন, নো সাচ রিপোর্ট।"

"ঠিক আছে মিঃ কপূর, রেজিস্টার দেখে এসে বলুন কে কবে ছুটি কাটিয়ে ফিরে এলেন। আমরা আশপাশেই আছি।"

॥ ৭ ॥

আরও প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে ওঁরা যখন তৃণভোজী প্রাণী, যেমন হাতি এবং গাধার চত্বরে হাঁটছেন, দেখা গেল ওসি বেনিয়াপুকুর অনুপম চ্যাটার্জি তাঁর দলবল নিয়ে বিউটি এবং জিজির খোঁজ করতে-করতে হন্তদন্ত হয়ে এদিকেই আসছেন। বিউটিকে দেখামাত্রই বললেন, "খুবই চিন্তার ব্যাপার।"

বিউটি কিছুটা নার্ভাস হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন, কী হয়েছে?"

"মিডিয়ার লোকজন ছেঁকে ধরেছেন। দলবেঁধে সব বাইরে অপেক্ষা করছেন।"

"কেন?" বিউটি বেশ বিরক্ত।

"ওঁরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

কবজি উলটে ঘড়ি দেখে বললেন, "এখন? আর মাত্র দু' ঘণ্টা পরেই যে প্রথম শো শুরু হবে। আপাতত ক্যানসেল করে দিন মিঃ চ্যাটার্জি।"

"সবই বলেছি। ওঁরা বলছেন, অন্তত পনেরো-কুড়ি মিনিট সময় দিতেই হবে।"

"ঠিক আছে চলুন। আপনারা আমার পাশেই থাকবেন কিন্তু। উলটোপালটা প্রশ্ন করলে আপনারাই সামলাবেন।"

গেস্ট লাউঞ্জেই সকলকে ডাকা হল। বিউটি তাঁর চেয়ারে বসতেই শুরু হল প্রশ্ন। একজন প্রবীণ সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, "মিস নায়ার, বন্যপ্রাণী নিয়ে খেলা দেখানোর ঝুঁকি অনেক। তা হলে মার্ভেলাস সার্কাস এত বন্যপ্রাণী নিয়ে খেলা দেখাচ্ছে কেন?"

দ্বিধাহীনভাবে বিউটি বললেন, "আমার সার্কাসে নো হান্টার, নো চাবুক। আমরা বন্যপ্রাণীদের কোনও অত্যাচারও করি না। ওদের সেবা-যত্ন যে কতটা আন্তরিকভাবে করা হয়, তা যে-কোনও দিন গোপনে এসেও দেখে যেতে পারেন। তা ছাড়া ওরা যে খেলাগুলো দেখাচ্ছে, তাতে ওদের কষ্ট হবে এমন কোনও খেলাই নেই। সবই মজার খেলা।" একটু দম নিয়ে বিউটি আরও বললেন, "আসলে কী জানেন, আমরা যারা তথাকথিত সভ্য, সভ্যতার বড়াই করি, তাদেরও অনেক কিছু শেখার আছে বন্যপ্রাণীদের কাছ থেকে। প্রত্যেক মানুষই, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীরা চায় বনের প্রাণীদের কাছ থেকে দেখতে। তারা মিলিয়ে দেখতে চায় কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের ফারাক কতটুকু। আর নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, আমার সার্কাসে ভিড় করছে কিন্তু স্কুল-কলেজ পড়ুয়ারাই। ওদের কৌতূহলকে চুরমার করে দেওয়া তো এক রকমের অন্যায় বলে আমি মনে করি।"

একজন মহিলা সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু ওই হিংস্র প্রাণীদের খেলা দেখানো তো খুবই রিস্কেরও ব্যাপার! যে-কোনও মুহূর্তে লোহার বেড়া টপকে দর্শকদের আক্রমণ করতে পারে।"

বিউটির মুখে তির্যক হাসি। বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, "হিংস্র। শব্দটা সৃষ্টি করেছে কে? আমরা মানুষরাই তো। ওদের পেট ভরা থাকলে এবং কেউ বিরক্ত না করলে ওরা পোষা বিড়ালের মতোই শান্ত। শুধু খিদের জ্বালায় কে হিংস্র নয় আমাকে বুঝিয়ে বলবেন কেউ? পশুরা খিদে পেলে শুধু নিজের নির্দিষ্ট শিকারের পিছনেই ছোটে।"

যেন বক্তৃতার নেশায় পেয়ে বসেছে ওঁকে। বেশ রক্ষণাত্মক ঢঙে বিউটি আরও বললেন, "আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন, পৃথিবীর সবচেয়ে হিংস্রতম প্রাণীটিকে পূর্বতন যুগোস্লাভিয়ার জু'তে বন্দি করে রাখা হয়েছে। এখন তো যুগোস্লাভিয়ার চিত্র বদলে গিয়েছে মানচিত্রে। কিন্তু সেই চিড়িয়াখানা এখনও আছে। হিংস্রতম প্রাণীটিও রয়েছে বহাল তবিয়তে।"

সাংবাদিকদের মধ্যে শুরু হল গুঞ্জন। মঙ্গলগ্রহে জীবনের স্পন্দন রয়েছে কি না এই জটিল তথ্য ওঁদের নখদর্পণে থাকলেও পৃথিবীর হিংস্রতম প্রাণীটির সন্ধান যে পাওয়া গিয়েছে, এই মূল্যবান তথ্যটি তাদের অজানা? এ যে সত্যিই লজ্জার কথা! সেই মহিলা সাংবাদিক সমস্ত সংকোচ দূরে সরিয়ে জানতে চাইলেন, "বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক, চিতা, কুমির, এদের চেয়েও হিংস্র?"

সাংবাদিক বৈঠকের রাশ এখন বিউটির হাতে। বেশ সাবলীল ভঙ্গিতে জবাব দিলেন, "ইয়েস, ওদের চেয়ে ভয়ংকরভাবে শিকারকে মারে ওরা, বিচিত্র পদ্ধতিতে, বুদ্ধি খাটিয়ে। বাঘ, সিংহের মতো শুধু শিকারের টুঁটি টিপে নয়।"

একজন বললেন, "তবে কি ইয়েতি?"

আবার অন্য একজন প্রশ্ন করলেন, "ব্রাজিলের সেই বিশালকায় বানর কি? না রাক্ষসখোক্কস?"

এঁদের সকলের ধারণা ধূলিসাৎ করে বিউটি বললেন, "ওই চিড়িয়াখানা ঘুরে দেখার পর দর্শকদের চোখে পড়বে একটি নোটিসবোর্ড। তাতে বিজ্ঞপ্তি লেখা, 'সাবধান। শিশুদের প্রবেশ নিষেধ। হিংস্রতম প্রাণীর খাঁচা সামনেই।' কৌতূহলী দর্শক একে-একে ঢোকেন সেই খাঁচার চত্বরে। ভিতরে যাওয়ার রাস্তা এমনই সংকীর্ণ যে, একজন মানুষের বেশি একসঙ্গে দু'জন ঢুকতে পারবে না। যেইমাত্র সেই হিংস্রতম প্রাণীটির খাঁচার সামনে দর্শকরা হাজির হবে, দেখতে পাবে খাঁচাটি শূন্য। ভিতরে দেখা যাবে একটি সুন্দর বড় আয়না। সেই আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখা যাবে দর্শকেরই অর্থাৎ মানুষেরই আপাদমস্তক ছায়া। তখনই চোখে পড়বে আয়নার উপরে একটি বিজ্ঞপ্তি। যার তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'মানুষ। হ্যাঁ প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম অবদান মানুষই পৃথিবীর হিংস্রতম প্রাণী।' "

গেস্ট লাউঞ্জে নেমে এল অস্বাভাবিক নীরবতা। এক সময় সেই নীরবতা ভেঙে অন্য এক সাংবাদিক জানতে চাইলেন, "ম্যাডাম, তদন্তের কত দূর? শোনা যাচ্ছে দলের অন্তর্কলহের বলি হয়েছে প্রাণীগুলো?"

বিউটি অনুপম চ্যাটার্জির দিকে তাকাতেই, তিনি এগিয়ে এসে বললেন, "তদন্ত চলছে। যদি দেখা যায় কোনও সদস্য ইচ্ছে করে এই হীন কাজটি করেছে, তার উপযুক্ত শাস্তিই হবে।"

"তবুও কত দিন লাগবে বলে মনে হয়?"

"দেখুন, এই ব্যাপারে কোনও সময়সীমা...।"

জিজি অনুপম চ্যাটার্জিকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "তদন্ত শেষ।"

"বলেন কী!" সাংবাদিকরা একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "অপরাধী ধরা পড়েছে?"

তদন্তকারী অফিসার ওসি অনুপম চ্যাটার্জি বিস্ময়ে হতবাক! এত বড় হাঁ করেছেন যে, মাছি নয়, একটি বড়সড় ভীমরুল গলে যেতে পারে! বলে কী লোকটা! পাগল নাকি?

বিউটিও বেশ অবাকই হলেন। তবে মুখে কিছু বললেন না। হট্টগোল একটু কমতেই জিজি বললেন, "চিতা বা রয়াল বেঙ্গলের মৃত্যুর জন্য কোনও মানুষ দায়ী, না অজানা কোনও রোগ তা জানাব কাল সন্ধে সাতটায়, এই গেস্ট লাউঞ্জে। সাদর আমন্ত্রণ রইল আপনাদের সকলের।"

সার্কাসের প্রথম শো কিছুক্ষণ আগেই শুরু হয়েছে। মাইকে ঘোষণা হচ্ছে, "*এবারের খেলা 'কানামাছি'। কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ।*" ব্যাকগ্রাউন্ডে রিদ্‌মিক মিউজিকের সুর।

খেলাটি জিজির ভারী সুন্দর লেগেছে। ব্রীড়া এবং স্ত্রী হৈমবতীকে নিয়ে দ্বিতীয় দিনেই এসেছিলেন সার্কাস দেখতে। দশটি ফুটফুটে মেয়ে, প্রত্যেকের বুকে নম্বর বোর্ড সাঁটা, এক থেকে দশ। একটি অ্যালসেশিয়ান কুকুর এই কানামাছি খেলাটিতে বাজিমাত করবে। কালো ফেট্টি দিয়ে কুকুরটির চোখ বেঁধে দেওয়া হবে। এরপর যে-কোনও একটি মেয়ে লাইন থেকে বেরিয়ে এসে চোখ-বন্ধ কুকুরটির মাথায় আলতো একটা টোকা দিয়েই নিজের জায়গায় ফিরে যাবে। তখন সকলে কোরাসে গান ধরবে, 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে ছোঁ'। অমনি সে লেজ নাড়তে-নাড়তে সেই মেয়েটির কাছে গিয়ে গম্ভীর স্বরে ডাক দেবে, 'ঘেউ-ঘেউ।' অর্থাৎ তুমিই আমার মাথায় টোকা দিয়েছিলে। এইভাবে সে দশটি মেয়েকেই চোখ-বন্ধ অবস্থায় খুঁজে বের করবে।

জিজির খেলাটি খুবই ভাল লেগেছে। কারণ, কুকুরের ঘ্রাণশক্তিকে বিউটি বুদ্ধিখাটিয়ে কী সুন্দর কাজে লাগিয়েছেন!

ওঁরা যখন সার্কাসের চৌহদ্দির বাইরে এলেন, ঘড়িতে তখন পৌনে পাঁচটা। শীতকালের বেলা, সন্ধে হয়-হয়। বিউটি ওঁদের বিদায় জানাতে এসেছেন।

জিজি বারবার বললেন, "কাল সন্ধে সাতটায় গেস্ট লাউঞ্জে বসা হবে। সেইমতো যেন ব্যবস্থা হয়। কোনও স্টাফ যেন কাল ছুটি না নেন।"

বিউটি বললেন, "কিছু ভাববেন না মিঃ গায়েন। সব ব্যবস্থাই হবে। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই...।"

"এখন একটিও কথা নয়। কারণ, চাই না কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ দানা বাঁধুক। সব কিছুর উত্তর কালই পাবেন। এখন যান,

শ্রী দেবাশীষ মৌলিক
সম্পাদিত
(by a Group of 20 paper setters)

মাধ্যমিকের সেরা
সহায়ক বই

মাধ্যমিক ইতিহাস সহায়িকা
Madhyamik English Sahayika
মাধ্যমিক বাংলা সহায়িকা
মাধ্যমিক গণিত সহায়িকা
মাধ্যমিক ভৌত-বিজ্ঞান সহায়িকা
মাধ্যমিক ভূগোল সহায়িকা
মাধ্যমিক জীবন-বিজ্ঞান সহায়িকা
মাধ্যমিকের ঐচ্ছিক জীববিদ্যা সহায়িকা
মাধ্যমিকের ঐচ্ছিক মৎস্যচাষ সহায়িকা
রায় হালদার-সাঁতরা প্রণীত

গৃহশিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই
মাধ্যমিক পরীক্ষায় লেটার মার্কস পেতে
হলে এই বইগুলির সাহায্য চাই-ই চাই

প্রান্তিক
স্কুল বই-এর জগতে নতুন পথের দিশারী

১৮, ডাঃ কার্তিক বসু স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
ফোন : ২৩৫০-৯৩৫১, ২৩৫২-৬৭১২,
টেলিফ্যাক্স্ : ২৩৫০-৯৩৫১

PRASA-02

ভিতরে যান মিস নায়ার। পরের ইভেন্টটিই তো সেই গাধাদের অঙ্ক কষা, নাকি?"

"না, না। এর পরের পরেরটা।" বলেই বিউটি হাসি মুখে বিদায় নিলেন। কারণ, এই মনমাতানো খেলাটি শুরুর আগে ওঁকে মেকআপ নিতে হবে।

অনেকক্ষণ থেকেই অনুপম চ্যাটার্জি উসখুস করছিলেন। সুযোগ পাচ্ছিলেন না। বিউটি বিদায় নিতেই তিনি জিজিকে প্রায় ঘিরে ধরলেন, "মিঃ গায়েন, যা বললেন সত্যি?"

জিজি বেশ রগড় করেই বললেন, "হ্যাঁ, সত্যি।"

"মানে, তদন্ত শেষ?"

"ইয়েস।"

"কাউকে তো অ্যারেস্ট করলেন না?"

"আগামী কালই হয়তো করতে হবে, মিঃ চ্যাটার্জি? ডিসিসাহেব অফিসে? না...?"

"একটু আগেও তো ফোনে কথা হল। লালবাজারেই আছেন।"

"একবার যে যাওয়া দরকার।"

সেলফোনে অনুজ মিত্রকে ধরে অনুপম চ্যাটার্জি বললেন, "স্যার, মিঃ গায়েন কথা বলবেন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিন। হ্যালো, মিঃ গায়েন, এনি ব্রেক থ্রু?"

জিজি শুধু বললেন, "ইয়েস।"

ডিসির অবিশ্বাসী কান ঠিক শুনছে কিনা, সেটা যাচাই করতে ফের জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ গায়েন, কী বললেন! ইয়েস?"

"হ্যাঁ, সাহেব। তদন্ত শেষ।"

"বলেন কী! এখনই চলে আসুন। বড়সাহেবও আছেন। ফোনটা ওসিকে দিন প্লিজ। আপনাদের আনার কথাটা...।"

ব্রীড়া, জিজির নির্দেশমতো বয়ামের ক্যারি ব্যাগটি নিয়ে দূরে-দূরেই থাকছেন। কৌতূহলী দৃষ্টি এড়ানোর জন্য উপরে একটি কাগজ ঢেকে রেখেছেন। দজ্জাল মাছিটি ভিতরে ভীষণ দাপাচ্ছে। চাপা বুঁ-বুঁ শব্দ বয়ামের ফুটো দিয়ে ভেসে আসছে। তবে তা সাধারণ মানুষের কানে পৌঁছনোর কথা নয়। ব্রীড়া জানেন, তাই অনুভব করছেন।

ডিসি অনুজ মিত্র বারবার ঘড়ি দেখছেন। সত্যি-সত্যি কি কিছু অগ্রগতি হয়েছে? না, স্রেফ বহ্বাড়ম্বর! জিজি মানুষটিকে তো ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন না। মাত্র আজই কয়েক ঘণ্টা আগে আলাপ। জিজির প্রতিশ্রুতি বিলকুল গুল, না তাঁর নিজেরই অ্যাসেসমেন্টে ভুল, এ নিয়ে ডিসি বেশ ধন্দে আছেন। এদিকে উচ্ছ্বাস চাপতে না পেরে বড়সাহেবকে তো বলে দিয়েছেন, তদন্ত শেষ। জিজি আসছেন। মুখ রক্ষা হবে তো? না! চ্যাটার্জি বড্ড দেরি করছে! রাস্তা জ্যাম নাকি?

চ্যাটার্জি চেম্বারে ঢুকতেই অনুজ মিত্র বললেন, "কী হল? এত দেরি? রাস্তা জ্যাম ছিল?"

অনুপম চ্যাটার্জি তো অবাক, "স্যার, এখন পাঁচটা দশ। মাত্র কুড়ি মিনিটে এসেছি। তাও ফ্লাইওভার দিয়ে। পার্ক সার্কাস ময়দান থেকে এর চেয়ে তাড়াতাড়ি তো আসা সম্ভব নয়!"

ডিসি ডিডি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। আসলে নিজের উৎকণ্ঠাই তাঁকে বেশি সময় সচেতন করেছে।

সময় নষ্ট না করে অনুজ মিত্র ওঁদের নিয়ে চললেন বড়সাহেবের রুমে। কমিশনারসাহেব বেশ খোশমেজাজেই ছিলেন। সাদরে বসতে বললেন জিজি এবং ব্রীড়াকেও। চেয়ারে দোল খেতে-খেতে সবিতাব্রত বসু বললেন, "মিঃ গায়েন!"

জিজিও গদগদ হয়ে বললেন, "বলুন স্যার।"

"শুনলাম তদন্ত শেষ।"

"ঠিকই শুনেছেন।"

"তা হলে কি ওরা কোনও জটিল রোগেরই শিকার?"

"একরকম তাই। কিন্তু মজা হল, রোগটি বা অসুস্থতা ঘটানো হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে।"

দোলন-চেয়ার থেমে গেল। কমিশনারসাহেব সোজা হয়ে বসলেন, "তার মানে, সাম ক্রিমিনালস আর অ্যাকটিভ!"

"অবশ্যই।" জিজির সংক্ষিপ্ত মন্তব্য।

"তা হলে অ্যারেস্ট করা হল না কেন?"

জিজি আন্দাজ করেছিলেন এরকম প্রশ্ন উঠবেই। তাই বেশ গুছিয়ে বললেন, "কাকে যে অ্যারেস্ট করা হবে তা তো এখনও স্পষ্ট নয়। দোষী ব্যক্তিকে পুরোপুরি চিহ্নিত করা যায়নি যে!"

কিছুটা বিরক্তি গ্রাস করল কমিশনারসাহেবকে। ফের দোল খেতে-খেতে মন্তব্য করলেন, "তা হলে আর তদন্ত হল কী! কালপ্রিট চিহ্নিত হল না, তার মোটিভ কী বোঝা গেল না, ক্রাইমটির পিছনে আর কে-কে রয়েছে, এসব কিছুর সমাধানই হল না। আর বলা হচ্ছে কিনা তদন্ত শেষ! মিঃ গায়েন, কিছু মনে করবেন না, সত্যিই কি তদন্ত শেষ?"

জিজি একইভাবে বললেন, "হ্যাঁ স্যার, তদন্ত শেষ।"

"তা হলে বাকি কাজটুকু শেষ করলেন না কেন? অ্যারেস্ট হতে পারে ভেবে যদি আসল কালপ্রিট গা-ঢাকা দেয়?"

কমিশনারসাহেবের চিন্তার কারণ, কালই তো পশুপ্রেমী সংস্থার নেত্রী মিস বিপাশা কাউর পাঁচ সদস্যের টিম নিয়ে রাজধানী এক্সপ্রেসে আসছেন। হাওড়া পৌঁছনোর কথা সকাল দশটা পঞ্চাশে। এসে পৌঁছলেই তো মিডিয়া ওঁদের নিয়ে মেতে উঠবে। তিলকে তাল করা হবে। তার আগেই যদি সমস্ত ব্যাপারটা গোটানো যেত! তিনি তো কিছুই বুঝতে পারছেন না, এই গোবিন্দ গায়েন কাজের কাজটা কী করলেন?

জিজি হাসি-হাসি মুখে বললেন, "না স্যার, সে ভয় নেই। কেটে পড়ার কোনও সুযোগই নেই। কারণ, কাউকে তো প্রকাশ্যে সন্দেহ করিনি।"

"কিন্তু সন্দেহভাজনদের তো নজর রাখা দরকার ছিল। তাই না?"

"স্যার, এত অধীর হচ্ছেন কেন? আমি তো মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময় চেয়েছি। কাল সাড়ে ছ'টার মধ্যে মার্ভেলাস সার্কাসের গেস্ট লাউঞ্জে আপনাদের একটু কষ্ট করে আসতে হবে। তারপর দেখুন না কী হয়। আমি তো চাই দিল্লির পশুপ্রেমীরাও সেখানে উপস্থিত থাকুন।"

কমিশনারসাহেব কিছুটা ধাতস্থ হলেন, "বেশ তাই যাব। দেখবেন মিঃ গায়েন, যেন লোক হাসানো না হয়!"

জিজি অভয় দিয়ে বললেন, "কিছু চিন্তা করবেন না স্যার। আপনাদের অবস্থা তো বুঝতেই পারছি। ভীষণ চাপের মধ্যে রয়েছেন। আমিও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করতেই চেয়েছি। আসলে সন্ধে হয়ে এল বলে তদন্ত গুটিয়ে নিলাম।"

ডিসি নড়েচড়ে বসলেন, "সন্ধে হওয়ার সঙ্গে তদন্ত শেষ করার কী সম্পর্ক মিঃ গায়েন?" কমিশনারসাহেবের চোখেও কৌতূহল।

জিজি একটু রহস্য করে বললেন, "আসলে সন্ধেবেলায় বা

রাত্রে তো ওদের পাওয়া যায় না সচরাচর!"

অনুজ মিত্র কিছুটা অধৈর্য স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "কী কী পাওয়া যায় না সন্ধে বা রাত্রে?"

"আজ্ঞে, মাছি।"

ওঁদের তিনজনই একসঙ্গে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, "মাছি? ...ফ্লাই?"

"ঠিক তাই।" জিজি অকপট।

কমিশনারসাহেব বেশ ফাঁপরে পড়লেন। ভাবছেন এ যে দেখছি পাগলের পাল্লায় পড়া গেল! কোথায় পশুনিধন তদন্ত, আর কোথায় মাছি? উনি কি ভেবেছেন ব্যাপারটি নিয়ে তামাশা করবেন? রাত্রে মাছি পাওয়া যাবে না বলে তদন্ত বন্ধ! মুখে অবশ্য এই বিরক্তির প্রকাশ ঘটালেন না। তবুও মাছির বিষয়টি খোলসা হওয়া দরকার। বললেন, "মিঃ গায়েন, ব্যাপারটি খুলে বলুন তো। মাছি নিয়ে মিছিমিছি হেঁয়ালি করছেন কেন?"

গোবিন্দ গায়েন সম্পর্কে অনুজ মিত্র যতটুকু পড়েছেন, তাতে ওঁর উপর আস্থা রাখাই যায়। নিশ্চয়ই এই মাছির বিষয়টি রহস্যে মোড়া । বেশ গম্ভীর স্বরে ডিসিও জানতে চাইলেন, "প্লিজ মিঃ গায়েন, একটু ভেঙে বলুন।"

জিজি বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন, "কিছু মাছি ধরতে হবে।"

মিঃ সবিতাব্রত বসুর চক্ষু চড়কগাছ। বলেন কী! মাছি ধরতে হবে! চোর, জোচ্চোর, ঠগ, ডাকাত, কিডন্যাপার ছেড়ে পুলিশ ধরবে কিনা মাছি! মজা হচ্ছে! দরকার নেই অমন তদন্তের! কিন্তু এভাবে তো মুখের উপর রাগ প্রকাশ করা শোভা পায় না। একসময় তো এই গোবিন্দ গায়েন মানুষটিই কলকাতা পুলিশের মুখ রক্ষা করেছিলেন। স্বর কিছুটা নরম করে জিজ্ঞেস করলেন, "কী মাছি? মৌমাছি, না কানামাছি?"

"আজ্ঞে, ওই কানামাছি।"

ডিসি জিজ্ঞেস করলেন, "ক'টা?"

"দশ-বিশটা পাওয়া গেলে ভাল হয়। তবে হ্যাঁ, ওই ছোট-ছোট সাধারণ মাছি নয় কিন্তু।"

কমিশনারসাহেব হাজার বিরক্তি চেপে জিজ্ঞেস করলেন, "তবে?"

"আজ্ঞে, ওই আম বা কাঁঠালের গন্ধে বা জিলিপির উপর যে বড়-বড় সোনালি মাছি উড়ে আসে, সেই মাছি। ডাঁশ পাওয়া গেলেও ক্ষতি নেই।"

ডিসি মনে-মনে মজা পেয়েছেন। জানতে চাইলেন, "আর কিছু?"

"হ্যাঁ, ওই মাছিগুলো একটি প্লাসটিকের বয়ামে ভরে রাখতে হবে। ট্রান্সপারেন্ট বডি হওয়া চাই। রঙিন বয়াম বা জার চলবে না। আর বয়ামের দেওয়ালে খুবই ছোট-ছোট কিছু ছিদ্র রাখতে হবে।"

অনুপম চ্যাটার্জি বললেন, "বুঝেছি। যাতে অক্সিজেনের অভাব না হয়।"

জিজি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, "ঠিক তাই। আর, ওই মাছির বয়ামটি একটি রঙিন ক্যারি ব্যাগে ভরে রাখতে হবে। ব্যস, আমার আর কিছু দাবি নেই। কাল বিকেলেই আমাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবেন। তখনই মাছিগুলো আমার চাই।"

ডিসি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কিছুই তো পেটে পড়েনি সেই দুপুর থেকে। কফি চলতে পারে?" জিজি না করলেন না। ডিসি স্ন্যাক্সও আনতে অর্ডার করলেন। ওদিকে বড়সাহেবের মুখ থেকে হাসি উধাও। কেবলই আপশোস করছেন, কেন এই উদ্ভট একটা লোকের পাল্লায় পড়লেন! প্রথমেই কাটিয়ে দিলেন না কেন? মাছি দিয়ে তদন্ত হবে! মাছি ধরবে কালপ্রিট? এই পঁয়ত্রিশ বছরের কর্মজীবনে এমন বিচিত্র তদন্তের কথা কখনও শোনেননি!

॥ ৮ ॥

মার্ভেলাস সার্কাসের গেস্ট লাউঞ্জ খুব বড় না হলেও বেশ প্রশস্ত। জনা পঞ্চাশেক মানুষের বসার ব্যবস্থা হয়েছে দু' সারিতে। মাঝের জায়গাটি ফাঁকা রাখা হয়েছে। সেখানে একটি টেবিল এবং দু'টো চেয়ার। ভি আই পি'রা এক সারিতে। সেখানে সিপি, ডিসি, ওসি এবং পশুপ্রেমী সংস্থার পাঁচ সদস্য এবং নেত্রী মিস বিপাশা কাউর। মিডিয়ার লোকজন বসেছেন দু' সারিতেই ছড়িয়েছিটিয়ে। সার্কাস কর্তৃপক্ষের সদস্যরা বসেছেন ভি আই পি'দের মুখোমুখি। বিভিন্ন টিভি চ্যানেল পুরো ব্যাপারটি রেকর্ড করবে বলে প্রস্তুত। এজন্য যথাস্থানে অনুমতি নিয়ে রেখেছে। জিজিরও আপত্তি নেই। এই অনুষ্ঠানের কথা মাথায় রেখে এবং বিশিষ্ট প্লেয়ারদের উপস্থিতি এখানে জরুরি মনে হওয়ায় সার্কাসের দ্বিতীয় শো বন্ধ রাখা হয়েছে।

মাঝের টেবিল-চেয়ারে জিজি এবং ব্রীড়া দরকারি কথা সেরে নিচ্ছেন। কাঁটায়-কাঁটায় সন্ধে সাতটা বাজতেই জিজি উঠে

দাঁড়ালেন। কমিশনারসাহেবকে বড্ড টেনস্‌ড লাগছে। কারণ একটাই। গোটা ব্যাপারটা যেন উপহাসের বিষয় না হয়।

প্রাথমিক দু'-চারটে কথা বলেই জিজি সরাসরি সার্কাস দলের সদস্যদের উদ্দেশে বলতে শুরু করলেন, "দেখুন, আপনারা সকলে কুশলী। কেউ ট্রাপিজের খেলায়, কেউ ব্যালান্সে, বর্শা ছোড়ায়, কেউ বা আবার হিংস্র জন্তুদের বশ মানানোর খেলায়। সত্যিই বিস্ময়ে অবাক হতে হয়, জীবন তুচ্ছ করে মারাত্মক সব খেলা অবলীলায় দেখিয়ে যান। মূলধন শুধুই আত্মবিশ্বাস, অসীম সাহস এবং দীর্ঘ অভ্যেস। আপনাদের কাছে আমি একটি নতুন খেলা উপহার দেব। তবে আপনারা যদি ভয় পেয়ে ব্যর্থ হন, তা হলে আমিই করে দেখাব।"

কমিশনারসাহেব ভাবছেন, লোকটির আসল উদ্দেশ্য কী? কোথায় চিতার মৃত্যুরহস্যের সমাধান, আর কোথায় নতুন ধরনের খেলা! এসব হচ্ছেটা কী? ততক্ষণে জিজি ক্যারি ব্যাগের খোলস থেকে ভিতরের বয়ামটি বের করে টেবিলে রেখেছেন। বিউটি নায়ার রীতিমতো অবাক! একটি মাছি নয় তো! অনেক ক'টা তো দেখা যাচ্ছে! তবে কি এক রাতে এত মাছি জন্মাল? কিন্তু সেই মাছিটি যেন একটু বড়সড়!

"আপনারা যাঁরা সাহসী এবং কুশলী প্লেয়ার, দয়া করে এগিয়ে আসুন।" জিজির হাবভাব বেশ নাটকীয়, "মিঃ বিক্রম আয়ার, প্রভু রাও, রাজেশ আপাং, অ্যালেক্স কোশি, নারায়ণ টোপ্পো, প্লিজ আমার টেবিলের সামনে আসুন।"

ব্যাপারখানা কী তা বুঝতে ওঁরা কাছে এলেন। জিজি বয়ামটি হাতে নিয়ে ওঁদের বললেন, "এর ভিতর কী আছে চোখে পড়ছে? অবশ্যই পড়বে। কারণ, স্বচ্ছ আবরণের ভিতর মাছিগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তাই না?"

সকলে বেশ জোর দিয়েই বললেন, "হ্যাঁ, দেখাই তো যাচ্ছে, মাছি।"

কিন্তু তাঁর তীব্র দৃষ্টিতে এড়াল না যে, ওঁদের মধ্যে একজনের গলা দিয়ে যেন স্বর বের হল না। এবার জিজি ওঁদের লক্ষ করে বলে চললেন, "এই মাছি ভর্তি বয়ামের ভিতর আপনাদের হাত ঢোকাতে হবে একে-একে। তবে হ্যাঁ, ডাঁশ জাতীয় কিছু মাছিও রয়েছে তো। কামড়াতেও পারে। ভয় নেই, আমরা ওষুধ নিয়েই প্রস্তুত। আসুন, আসুন মিঃ আপাং। হাত দিন।"

বিক্রম আয়ার এবং প্রভু রাও বেশ রুক্ষভাবেই বললেন, "এসবের মানে কী?"

তা দেখে নারায়ণ টোপ্পো এবং অ্যালেক্স কোশিও শামিল হলেন, "এই সব ফালতু খেলার দরকারই বা কী?"

অতিথি-অভ্যাগতরা সকলে নির্বাক। ডিসি অনুজ মিত্র নিশ্চিত, জিজির কোনও লুকনো উদ্দেশ্য রয়েছে। নইলে উনি তো খামোকা সময় নষ্ট করার পাত্র নন।

উত্তর যেন রেডিই ছিল, "বেশ।" সাবলীল স্বরে জিজি বললেন, "ধরুন, তদন্তের সুবিধে হবে। প্লিজ, সহযোগিতা করুন। এত সব রিস্কের খেলা দেখান, আর সামান্য মাছির বয়ামে হাত ঢোকাতে পারছেন না!"

তখন প্রভু রাও বললেন, "যদি কামড়ে দেয়!"

রাজেশ আপাং বললেন, "যদি ওর মধ্যে বিষাক্ত মাছি থাকে!"

বিক্রম আয়ার বললেন, "ভয় পাওয়ার কথা নয়। আসলে গা ঘিনঘিন করে।"

অ্যালেক্স কোশি বললেন, "হাত ঢোকাতে পারি। তবে একটা শর্তে।"

জিজি জিজ্ঞেস করলেন, "শর্তটা বলুন।"

অ্যালেক্স কোশি বললেন, "বয়ামটা ভাল করে দেখে তবেই হাত দেব। আমাকে দেখতে দিন।"

"বেশ তো।" বলেই জিজি মাছিভর্তি বয়ামটি অ্যালেক্স কোশির হাতে তুলে দিলেন।

কোশি সেই স্বচ্ছ বয়ামটি চড়া নিয়ন আলোর সামনে তুলে ধরে বেশ কিছুক্ষণ দেখলেন। তারপর বললেন, "প্যাঁচ খুলুন। আমি হাত রাখব।"

জিজি জানতে চাইলেন, "ক' সেকেন্ড? দশ? পনেরো? বিশ?"

সকলে দৃশ্যটি দেখতে-দেখতে ভাবছেন, এ আবার কী রঙ্গ? ওদিকে অ্যালেক্স কোশি ফস করে বলে বসলেন, "বিশ কেন, পুরো এক মিনিট হাত ঢুকিয়ে রাখব।"

"ভয় করবে না? যদি কামড়ে দেয়?"

"আপনি তো বলছেন ওষুধ মজুত আছে।" কোশির স্মার্ট জবাব।

জিজি এবার মোক্ষম বাণটি ছাড়লেন, "মিঃ কোশি, আপনার সহকর্মীরা যেখানে হাত রাখতে ভয় পেলেন, আপনি সাহস দেখাচ্ছেন কী করে?"

"দেখুন, সম্মানিত অতিথিদের সামনে এই মার্ভেলাস সার্কাসের মুখরক্ষা করাটাও দরকার। ওঁরা কী ভাববেন? যেখানে আমরা নির্ভয়ে সিংহের খাঁচায় ঢুকছি, সেখানে মাছিকে ভয় পাওয়া কি শোভা পায়?"

অ্যালেক্স কোশির বাগ্মীতায় জিজি বেশ খুশি হয়ে বললেন, "আর, এই বয়ামটার ভিতরে?"

ততক্ষণে ব্রীড়া নির্দেশমতো ক্ষিপ্র হাতে সেই বয়ামটি বের করে টেবিলে রেখেছেন, যার মধ্যে গত কাল সেভেন-এফ তাঁবুর ভিতর থেকে ধরা মাছিটিও বন্দি। ভীষণ রাগে সে গোঁত্তা মারছে বয়ামের দেওয়ালে।

"মিঃ অ্যালেক্স কোশি? এই বয়ামের ভিতরেও হাত রাখতে নিশ্চয়ই ভয় পাবেন না?"

হাই ভোল্টেজ লাইনে হাত লেগে যাওয়ার ভয়ে মানুষ যেমন ছিটকে সরে যায়, অ্যালেক্স কোশিও সেরকম ছিটকে গেলেন দু' হাত। মাছি নয়। তিনি যেন বয়ামের ভিতর গোখরো সাপ দেখছেন!

জিজি বেশ গলা চড়িয়ে বললেন, "মিঃ কোশি, চেনেন? চেনেন নিশ্চয়ই এই মাছির জাতটাকে? নইলে কানামাছির বয়ামটি আলোয় ফেলে অত খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখবেনই বা কেন? যখন দেখলেন আপনার আমদানি করা মাছিটি আগের বয়ামে নেই, তখনই রাজি হলেন। ঠিক কি না?"

আক্রোশে ফেটে পড়ে অ্যালেক্স কোশি হাত-পা ছুড়ে চিৎকার করে বললেন, "অল বোগাস, ফল্‌স! বেস্‌লেস!"

জিজি প্রসঙ্গ পালটে জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে মিঃ কোশি, সেদিন কাঁচা মাংসের টুকরো নিতাইয়ের কাছে চাইলেন কেন? ইঁদুর ধরবেন বলে? কই, ইঁদুরকলটা কই?"

ম্যানেজার মিঃ কপুর বললেন, "র‍্যাট নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই।"

"তা হলে সেই কাঁচা পাঁঠার মাংসের টুকরোটা গেল কোথায়, বলবেন মিঃ কোশি?"

রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে অ্যালেক্স কোশি তাঁর হাত মুঠো করে বিদ্যুৎ গতিতে একটা ছোবল মারতে চাইলেন জিজির মুখ লক্ষ করে। ছোটখাটো মানুষ জিজি আগাম টের পেয়ে ধপাস করে বসে পড়লেন পাশের চেয়ারে। কোশির বিরাশি সিক্কার ঘুসি নাগাল পেল না জিজির।

ততক্ষণে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রভু রাও, বিক্রম আয়ার, নারায়ণ টোপ্পো, রাজেশ আপাং ঝাঁপিয়ে পড়েছেন অ্যালেক্স কোশিকে সামলাতে। ডিসি ডিডি ভীষণ উত্তেজিত। ওসি অনুপম চ্যাটার্জিকে আদেশ করলেন, "অ্যারেস্ট হিম।"

ফোর্স ছুটে এসে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিল। কোশি শুধু হাত কামড়াচ্ছেন, কেন তিনি জিজির পাতা ফাঁদে পা দিতে গেলেন। কানামাছিদের বয়ামটা অত পরীক্ষা করে দেখার কী-ই বা দরকার ছিল? অন্য সকলের মতো পিছু হটে গেলেই তো আপদ চুকে যেত। এ তো যেচে ধরা দেওয়া।

বিউটি নায়ার মুগ্ধ বিস্ময়ে জিজির কেরামতি লক্ষ করছিলেন। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছেন না, ওই মাছিটি দেখে কোশি কেন এত ভয় পেলেন? কেনই বা তিনি জিজির উপর চড়াও হলেন? আর মাংসের টুকরো, ইঁদুরকল, এসবের মানে কী?

কমিশনারসাহেব বুদ্ধিমান মানুষ। ঘটনার দ্রুততায় এটা বুঝলেন, ওই মাছিটি নিশ্চয়ই ঘাতক মাছি, এবং তা আমদানি করেছে ওই অ্যালেক্স কোশি।

পশুপ্রেমী সংস্থার মিস বিপাশা কাউর এবং তাঁর সঙ্গীরা শুধু এইটুকু বুঝলেন যে, ওই মিঃ কোশিই দোষী এই চিতার মৃত্যুর জন্য।

মিডিয়ার মানুষজনও রুদ্ধশ্বাসে লক্ষ করছিলেন সব ঘটনা। ব্যাপারটি ক্যামেরাবন্দি হয়ে চলেছে। একজন সাংবাদিক কিছু প্রশ্ন করতে যাবেন, জিজি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। শুরু করলেন এইভাবে, "আপনারা জানেন, মোট চারটি চিতা এবং দু'টো বাঘ মারা গিয়েছে সাত দিনের মধ্যে। আরও কয়েকটি চিতা অসুস্থ। তবে পরিচর্যায় ধীরে-ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। কাল যখন অসুস্থ চিতাদের দেখলাম, তখনই ব্যাপারটি ধরা পড়ল। ওরা ভুগছে স্লিপিং সিকনেসে।"

এক সাংবাদিক কারণ জানতে চাইলে জিজি বললেন, "সবই বলছি। একটু ধৈর্য ধরুন। আফ্রিকার জঙ্গলে এক রকমের মাংসাশী মাছি আছে। ওরা সচরাচর মাংসাশী প্রাণীদেরই কামড়ায়। সেই কামড়েই ওদের লালা থেকে এক ধরনের জীবাণু পশুর রক্তে মিশে গিয়ে মগজকে অসাড় করতে থাকে। তখন পশুগুলো স্লিপিং সিকনেসের কবলে পড়ে। খাওয়াদাওয়া, শিকার ধরা ছেড়ে ওরা শুধু ঘুমিয়েই থাকে। তারপর এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

"ওই সাঙ্ঘাতিক মাছির নাম সিসি মাছি। এই মাছির কাছে বাঘ, চিতা এমনকী সিংহও কাবু। তবে সিংহরা বেঁচে যায়, কারণ, ওদের প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্য পশুর চেয়ে বেশি। ভারতে এখনও এই সিসি মাছির হদিশ মেলেনি। তবে মিঃ অ্যালেক্স কোশির কৃপায় কয়েকটি ভয়ংকর মাছি আমদানি হয়ে গেল। ফলে আমাদের চিড়িয়াখানার প্রাণীদের রিস্ক বেড়ে গেল। সেই জন্যেই আমি কড়া ডোজে ডিডিটি স্প্রে করতে বলি। কারণ, পশুদের খাঁচার আশপাশে থাকলে, হয় মরে যাবে, নয়তো পালাবে। সেই কড়া ঝাঁঝ এড়াতে একটি মাছি কোনও একটি তাঁবুর ভিতর আশ্রয় নেয়। সেই মাছিটিই ধরে এই বয়ামে রেখেছি। অথচ দয়ারাম বলল, এই মিঃ কোশিই স্প্রে করতে বাধা দিয়েছিলেন কিছুদিন আগে। তাই স্প্রে করা বন্ধ ছিল।

"হ্যাঁ, মাংসের টুকরোর ব্যাপারটা? অনুসন্ধানে খবর বের হল, একজন সদস্য কাঁচা মাংসের টুকরো চেয়েছেন নিতাইয়ের কাছে। কারণ জানতে চাইলে সেই সদস্য বলেছেন, ইঁদুরকলে ইঁদুর ধরবেন। অথচ ইঁদুরের উৎপাত নেই ম্যানেজার মিঃ কপূর আমাকে জানিয়েছেন। নিতাই যখন মিঃ অ্যালেক্স কোশিকে কাল দূর থেকে চিনিয়ে দেয়, ওই মানুষটি মাংসের টুকরো চেয়েছেন, তখনই নিশ্চিত হই যে, ওঁর কাছেই সিসি মাছি রাখা ছিল। মাছিগুলোকে খাওয়ানোর জন্যই মাংসের দরকার ছিল।

"সত্যি বলতে কী, বেশ ধন্দেই পড়েছিলাম। এখানে সিসি মাছি না থাকলে স্লিপিং সিকনেস হয় কী করে? কাল মিঃ কপূর রেজিস্টার ঘেঁটে বলেছেন, অন্য দু'জন সদস্যের মতো অ্যালেক্স কোশিও এক মাসের ছুটিতে গিয়েছিলেন। তিনি যেদিন ছুটি থেকে ফিরে কাজে যোগ দিয়েছেন, তার তিন দিনের মাথায় পশুগুলো আক্রান্ত হয়েছে এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। হয়তো মিঃ কোশির তাঁবু সার্চ করলে কোনও কার্টুনের ভিতর এই রকম বয়ামে আরও কিছু সিসি মাছি থাকতেও পারে। এই জন্যেই কোশি ডিডিটি স্প্রে বন্ধ রাখার জন্য সকলকে তাতিয়ে ছিলেন।"

তা শুনেই অ্যালেক্স কোশি চমকে তাকালেন। তিনি যেন নিজেই এখন ইঁদুরকলে পড়ে গিয়েছেন। একসময় তাঁর সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে গেল। গড়গড় করে কবুল করলেন সব কিছু। তিনি বিউটি, প্রভু রাও এবং পামেলার উপর প্রতিশোধ নিতেই এই কাজ করেছেন। তিনি অনেক আগেই শুনেছিলেন, বাঘ-চিতার যম হল সিসি মাছি। যখন তাঁর হাত থেকে রিংমাস্টারের হান্টার কেড়ে নেওয়া হল, তখন তিনি ছুটি নিয়ে দিল্লি চলে যান। ওখানেই একটি উগান্ডার ছাত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। বেশ কিছু টাকার বিনিময়ে তিনি এই মাছি আনিয়ে নেন রিসার্চের অজুহাতে। হ্যাঁ, আরও ছ'-সাতটি মাছি তাঁর তাঁবুতে লুকনো রয়েছে। তিনি পুলিশ টিমকে তাও দেখিয়ে দেন।

॥ ৯ ॥

পরদিনই কমিশনারসাহেবের চেম্বারে জিজি এবং ব্রীড়া হাজির হয়েছেন আমন্ত্রণ রক্ষা করতে। বিউটিও উপস্থিত। তিনি একটি খাম তুলে দিলেন জিজির হাতে। তাতে তিরিশ হাজার টাকার চেক। ডিসি করমর্দন করে বললেন, "আমার বাড়িতে আসতে হবে কিন্তু। ছেলে আপনার খুব ভক্ত।"

কমিশনারসাহেব হ্যান্ডশেক করে বললেন, "মাঝে-মাঝে আসবেন কিন্তু। সত্যি বলছি, ভাবতেই পারিনি, মাছি ধরবে কালপ্রিট?"

হ্যাঁ, মার্ভেলাস সার্কাস পুরোদমে এক মাস তো চললই। আরও পনেরো দিন শো চালাতে হল দর্শকদের দাবি মেনে। আর হ্যাঁ, গাধার অঙ্ক কষার খেলাটিতে একটু সংযোজন করেছেন বিউটি। শুধু হাসতে-হাসতেই নয়। কঠিন অঙ্কগুলো দরাজ কণ্ঠে গাইতে-গাইতেও সমাধান করছে। গাধাদের আত্মবিশ্বাস এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে, বিউটি ভাবতে শুরু করেছেন, এবার অ্যালজেব্রা শেখালে কেমন হয়।

(সমাপ্ত)

কেরোসিনে কম্পিউটার

সৈকত মুখোপাধ্যায়

"কী হে বিজ্ঞানী, খাঁচায় ওগুলো কী পুষেছ? টিকটিকি মনে হচ্ছে!" শ্বশুরবাড়িতে ঢুকতে-ঢুকতে চোদ্দো বছরের ছোট্ট শ্যালক তপুর ঘরে উঁকি দিয়ে প্রশ্ন করলেন নতুন জামাই রুদ্র।

"হ্যাঁ, হেমি ড্যাটাইলাস-ক্ল্যাবি ভিরিডিস।" এমন উত্তর শুনে একটু থমকালেন রুদ্র। তারপর আবছা অন্ধকারে ঘরের কোণে রাখা কাচের জারগুলোর দিকে নজর গেল তাঁর, "আর ওগুলো? সিম্পল মাকড়সা তো?"

"ডলোমিডিস-ফিমব্রায়াটাসও বলতে পারেন।"

রুদ্রর বউ লিলির মোটেই ইচ্ছে করছিল না খ্যাপাটে ছোট ভাইয়ের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করতে। তাঁর এই একমাত্র ভাইটি ছেলেবেলা থেকেই মনেপ্রাণে একজন আবিষ্কারক। মুশকিল হচ্ছে, দু'-এক মাস অন্তরই তার গবেষণার বিষয় বদলে যায়। বাড়িতে ঢোকার মুখে বাগানের এই ঘরটায় তপু. তার ল্যাবরেটরি সাজিয়েছে। সেই ঘরে সে নিজে আর তার সব সময়ের সঙ্গী নেপালি ছেলে গুরুং সারাক্ষণ নানারকম খুটখাট করে কাটায়। এই জন্যে অনেকেই তপুকে একটু পাগল ভাবে। তা ছাড়া, তপু যখন যে বিষয় নিয়ে মগ্ন থাকে, কথার মধ্যেও তার ছাপ পড়ে যায়। যেমন, সে যখন মহাকাশ যাত্রার আয়োজন করছিল, তখন বাগানের ঘরটা ছিল আর্থ-স্টেশন, পোষা কুকুর টম হয়েছিল 'লাইকা', আর ছোড়দি লিলি রাতারাতি 'তেরেস্কোভা'র সম্মান পেয়েছিলেন। আবার যখন তপু মিঞা তানসেনের সেই গানের সুরে বৃষ্টি নামানো আর আগুন জ্বালানোর ব্যাপারটা বাস্তবে ঘটাবার চেষ্টা করছিল, তখন সেই একই ঘর হয়ে গেল মাইহার, আর ছোড়দি 'বাবা আলাউদ্দিন'।

এই জন্যেই লিলি নতুন বরকে নিয়ে তপুর মুখোমুখি হতে চাইছিলেন না। কী জানি, তপু তাঁর সামনেই আবার লিলিকে কোন বিদ্‌ঘুটে নামে ডেকে বসে। তা ছাড়া অনেক দিন পর বাপের বাড়ি ফিরে লিলির মন আনচান করছিল ভিতর বাড়িতে যাওয়ার জন্য, যেখানে মা, কাকিমা, জেঠিমা সকলে রয়েছেন। তাই এগিয়ে যেতে-যেতে লিলি ঘাড় ঘুরিয়ে রুদ্রকে ডাকলেন, "আরে, তপুর পাগলামি দেখার অনেক সময় পাবে। আগে ভিতরে চলো তো!"

দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তপু তার ছোড়দির উদ্দেশে হুঙ্কার ছাড়ল, "অ্যাই গিলা মনস্টার, শোন, আমি পাগল? আর

তুই বিয়ে করে খুব বুদ্ধিমান হয়েছিস, না? লাস্ট পরীক্ষাতেও তো অঙ্কে পঁয়ত্রিশ পেয়েছিলিস। জেলাসির জেলসিমিয়াম কোথাকার!"

রুদ্র পকেট থেকে একটা চকোলেট বের করে তপুর হাতে দিয়ে বলল, "রাগ কোরো না তপুবাবু। আমি হাত-মুখ ধুয়েই তোমার ঘরে চলে আসছি। তোমার এবারের রিসার্চের ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং লাগছে। গিলা মনস্টার, জেলসিমিয়াম, পোকামাকড় আর হোমিওপ্যাথি মিশিয়ে একটা কিছু করতে চলেছ মনে হচ্ছে?"

চকোলেট পেয়ে খুশি হয়ে তপু বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ। আপনি বেশ বুদ্ধিমান। কিন্তু ছোড়দিকে বিয়ে করাটা আপনার পক্ষে ব্লাটা, ওরিয়েন্টালিস হয়েছে।"

"মানে ব্লান্ডার হয়েছে?"

"ইয়েস। ওটা মহা হিংসুটে। আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিভাটা ছোড়দি কোনও দিনই সহ্য করতে পারে না।"

॥ ২ ॥

সত্যি কথা বলতে কী, তপুর বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলো তার বাড়ির বা পাড়ার কেউই ভাল চোখে দেখে না। আর তার কারণও আছে। এগারো বছর বয়সেই তপু খেয়াল করে যে, পাড়ার সব বাড়িতে সন্ধে হলেই বিচ্ছিরি ফটফটে সাদা টিউবলাইট জ্বলে অথচ ইলেকট্রিসিটিতে সামান্য একটু রং মেশালেই কেমন চার দিকে রঙিন আলোর বন্যা হয়। সে দশটা টাকা দিয়ে চা-এর দোকানের একটা ছেলেকে রাজি করায় ইলেকট্রিক কোম্পানির ট্রান্সফর্মারে এক বালতি লাল রং ঢেলে দিতে। ছেলেটা কোনওরকমে সে যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেলেও, ট্রান্সফর্মার উড়ে গিয়ে সেই ঘোর গ্রীষ্মে গোটা পাড়া দু' দিন বিদ্যুৎহীন ছিল।

এর পর তপোব্রত ঘোষাল অর্থাৎ তপুকে টানে মহাকাশ। রকেটের খোলটা তৈরিই ছিল, পাড়ার বন্ধ বাল্ব কারখানার লোহার চিমনিটা। তপু আর তার শাগরেদরা রাতের অন্ধকারে চিমনির গোড়ায় তপুর উদ্ভাবিত রকেট-ফুয়েল ঠেসে, তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। প্রচণ্ড শব্দে পাড়া কাঁপিয়ে চিমনি ফেটে যায়। তারপর দমকল, অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ! সবচেয়ে দুঃখের কথা, সেই দুর্ঘটনায় তপুর ডান হাতের আংটি পরার আঙুলটা উড়ে যায়। তবুও তার স্বভাব এতটুকু বদলায়নি। তবে তারপর থেকে তপুর মা, কাকিমারা তাকে আর বাড়ির বাইরে একা বেরোতে দেন না। নেপালি ছেলে গুরুং সারাক্ষণ তার পাহারায় থাকে। তা সত্ত্বেও তপুর উদ্ভাবনী শক্তির ঠেলায় গত তিন বছরে বাড়িতে এবং পাড়ায় অনেক ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। সোলার-পাওয়ারড-সাইকেল গিয়ে পড়েছে মিষ্টির দোকানের ফুটন্ত রসের কড়াইয়ে। ছ্যাঁকাপোড়া খাওয়া মিষ্টির কারিগর বাদলকে তপু সান্ত্বনা দিয়েছে, তাকে সে অটোমেটিক জিলিপি ভাজার মেশিন বানিয়ে দেবে। পাড়ার প্রাইমারি স্কুলের পাঁচটা ছোট্ট ছেলে তপুদাদার কাছ থেকে বুদ্ধি বাড়ানোর ওষুধ খেয়েছিল। রাতারাতি তাদের সব চুল সাদা তো হয়েই গিয়েছিল, তার উপরে তারা একের ঘরের নামতা অবধি ভুলে গিয়েছিল।

তবুও তপুর উপর কেউ তেমন রাগ করতে পারে না, দু'টো কারণে। এক তো সে বাড়ির একমাত্র ছেলে, বোনেদের সকলের চেয়ে ছোট। দুই, পড়াশোনায় সে আশ্চর্য রকমের ভাল। তাকে কেউ পড়তে বসতে দেখে না, অথচ পরীক্ষায় প্রায় সব সাবজেক্টেই সে ফুলমার্কস পায়। আর দু' বছর পরই সে মাধ্যমিক দেবে। পাড়ার অনেকেই তাই লুকিয়ে রিহার্সাল দিচ্ছে যে, টিভির লোকেরা প্রথম স্থানাধিকারী তপোব্রত ঘোষালের ইন্টারভিউ নিতে এলে জনতার মধ্যে থেকে তারা কে কী বলবে। মোট কথা, চড়কডাঙার ভবিষ্যৎ গৌরবের কথা ভেবে, সেখানকার বাসিন্দারা তপুকে বেশ আশকারাই দেয়।

॥ ৩ ॥

তবে এবার তপুর মা মানে রুদ্রর শাশুড়ি রুদ্রর কাছে কাঁদলেন, "ও বাবা রুদ্র, তুমি আমার ছেলেটাকে বাঁচাও। ও

তো বাড়ির কারও কথা শোনে না। তোমাকেই ইঞ্জিনিয়ার বলে একটু ভক্তিশ্রদ্ধা করে। তুমি ওকে টিকটিকি, মাকড়সা ঘাঁটতে বারণ করো। ভয়ংকর বিষাক্ত জীব ওসব। আমি সারাক্ষণ ভয়ে-ভয়ে থাকি।”

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর রুদ্র তপুর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তপু চিত হয়ে শুয়ে বোরিক-এর 'প্রিন্সিপলস অফ হোমিওপ্যাথি' পড়ছিল। রুদ্রকে দেখে উঠে বসল। রুদ্র সরাসরি কাজের কথায় চলে গেলেন, “তুমি নাকি টিকটিকি আর মাকড়সার বিষ থেকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ বানাচ্ছ তপুবাবু?”

“কে নালিশ করলেন, মা?”

“আহা, নালিশ করবেন কেন? জাস্ট ইনফরমেশন দিলেন।”

“ওসব আমি বুঝি। মা হচ্ছেন অ্যাংজাইটির অ্যালোভেরা-থার্টি। জেঠিমাও আমার গবেষণার বিষয়ে সমান অ্যান্টিম-টার্ট, মানে... বুঝলেন তো?”

“জলের মতো। উনিও অ্যান্টি-পার্টি। এ তো সালফারের মতো সহজ ভাষা!”

তপু চোখ কুঁচকে জামাইবাবুর দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল, জামাইবাবু কি মজা করছেন! রুদ্রর মুখে-চোখে সেরকম কোনও লক্ষণ দেখতে না পেয়ে খুশি হয়ে বলল, “টিকটিকি আর মাকড়সার মধ্যে মিল কোথায় বলুন তো?”

“দু'জনেই ঘরের দেওয়ালে ঘোরে। দু'জনেই বিষাক্ত।”

“ঠিক বললেন না। আমাদের ঘরোয়া টিকটিকি আর মাকড়সার বাইরে আরও হাজার প্রজাতির টিকটিকি আর মাকড়সা আছে, যারা মেরু অঞ্চল থেকে মরুভূমি, সর্বত্র বাস করে। বাসস্থানটা এদের মধ্যে কোনও মিলই নয়। এদের মিল অন্য জায়গায়।”

“তুমিই বলো তা হলে,” বললেন রুদ্র।

“ব্যাপারটা আপনিও জানেন। মাকড়সার পা, অন্য মাকড়সার সঙ্গে লড়াইয়ে প্রায়ই কেটে যায়। সেই পা কিন্তু আবার গজায়। একই কাণ্ড ঘটে টিকটিকির লেজের ব্যাপারে। কাটা লেজ কয়েক দিনের মধ্যেই আবার দিব্যি গজিয়ে যায়। ভাবুন তো, যদি মানুষের এমন হত!”

“বলো কী! মানুষের লেজ? ফিরে আসবে!” রুদ্র তো হাঁ।

“আঃ, লেজ নয়, লেজ নয়। কাটা হাত, কাটা পা এই সব। আহা, পৃথিবীতে আর বিকলাঙ্গ বলে কেউ থাকত না। জামাইবাবু, আপনি সকলকে বোঝান, আমার উদ্দেশ্য কত মহৎ। ওদের ইগ্নেশিয়া অপনি ভেঙে দিন।”

“মানে ইগনোরেন্স?”

“হ্যাঁ।” তপু আবার চিত হয়ে শুয়ে বইটা চোখের সামনে তুলতে যাচ্ছিল। রুদ্র তাকে থামালেন।

“দাঁড়াও, দাঁড়াও। তোমার এই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কীভাবে, তা তো বললে না?”

“যে হরমোন ঘটনাটা ঘটায়, সেটাকে মাকড়সা আর টিকটিকির শরীর থেকে আলাদা করে ফেলেছি। জিনিসটা অস্বীকার করব না, তীব্র বিষ। কাজেই হোমিওপ্যাথির তত্ত্ব অনুযায়ী খুব সূক্ষ্ম পরিমাণে শরীরে ঢোকালে ওই বিষ আমাদের শরীরেও একই কাজ করবে। কিন্তু কোথাও একটা গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।” বিষণ্ণ হয়ে এল তপুর গলার স্বর, “অন্যদের শরীরে ওই হরমোন-এক্সট্র্যাক্ট কাজ করছে না।”

তপুর টেবিলে রাখা একটা কোল্ডড্রিঙ্কসের বোতলে মাঝে-মাঝে চুমুক দিচ্ছিলেন রুদ্র। তপুর এই কথা শুনে তিনি মুখেরটুকু ফচাৎ করে মেঝেয় কুলকুচি করে দিয়ে খুব নার্ভাস গলায় জিজ্ঞেস করলেন, “এক্সপেরিমেন্টটা কার উপর করছ ভাই?”

মুচকি হেসে তপু বলল, “আপাতত টমের উপর।”

॥ ৪ ॥

তপুর জ্যাঠামশাই ভারী ভক্তমানুষ। সর্বত্রই তিনি ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখতে পান। যেমন ক'দিন আগেই তপুর বড়পিসির বাড়িতে এয়ার কন্ডিশনার দেখে তাঁর প্রতিক্রিয়া হল, “আহা, ভগবান কেমন এসি মেশিনটা বানিয়েছেন। আবার রিমোট কন্ট্রোলের ব্যবস্থাও করেছেন দেখছি।”

ক'দিন আগে তপুর মায়ের রান্না শুক্তো খেয়ে তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মতো এঁটো হাতেই বসে রইলেন, নড়েনও না চড়েনও না। সকলে ঠেলাঠেলি করতে সেই ভাবসমাধি ভেঙে তিনি বললেন, “ভাবছিলাম, এক শুক্তো রাঁধার জন্য ঈশ্বরকে কত ভিন্ন-ভিন্ন জিনিস ফলাতে হয়েছে। কাঁচকলা, উচ্ছে, বেগুন, কুমড়ো, পেঁপে আবার বড়ি দেওয়াও শিখিয়েছেন বউমাকে।”

তা এহেন জ্যাঠামশাইয়ের জন্যে ওবাড়ির পোষ্যদের সব মজার-মজার নাম। টিয়াপাখির নাম কাকলি, কুকুরের নাম টম, বিড়ালের নাম অভিমানী, গোরুর নাম মঙ্গলা। শুধু একঝাঁক পোষা মুনিয়ার তিনি আলাদা-আলাদা নামকরণ করতে পারেননি। কারণ, ওদের সকলকে একই রকম দেখতে। তাই জ্যাঠামশাই ওদের একত্রে ডাকেন 'বালখিল্য' বলে। টম জাতে নেড়ি। শিশুকালে সাঁওতাল পাড়ার ছেলেরা তার লেজটা একদম গোড়া থেকে কেটে দিয়েছিল, যাতে সে তেজি হয়। দুঃখের কথা টমের মতো ভিতু কুকুর ভূ-ভারতে নেই। সে প্যাঁচা ডাকলে চৌকির তলায় লুকোয়, হুলো বিড়াল অভিমানী সদর দরজায় বসে থাকলে টম খিড়কি দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢোকে।

রুদ্র যখন ভিতর বাড়িতে গিয়ে খবর দিলেন যে, তপুর গবেষণায় টমকেই টিকটিকির টিংচার খেতে হচ্ছে, তখন সেই কেষ্টর জীবের ভালমন্দের কথা ভেবে সকলের মুখের হাসি শুকিয়ে গেল। তপুর জন্য উদ্বেগ তো রইলই।

বাড়ির সকলে মহা আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছে। শুধু তিন জন ছাড়া। একজন, নেপালি কাজের লোক গুরুং। সে নিজের হাতে তপুর পোষা টিকটিকিদের উচ্চিংড়ে খাওয়ায়, মাকড়সাদের জন্য মাছি ধরে আনে। কাজেই সে এসব ভয়ডরের ঊর্ধ্বে। জ্যাঠামশাইও সারাক্ষণ ঊর্ধ্বমার্গে বিচরণ করেন। তিনি ইতিমধ্যেই একদিন তপুর ঘরে গিয়ে মাকড়সাদের সমষ্টিগত নামকরণ করেছেন 'অষ্টপদ', আর টিকটিকিদের 'বিচ্ছু'। উপরন্তু বিচ্ছুদের নরম শরীর মানুষের পায়ে চিঁড়েচ্যাপটা হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে ভগবান কত যত্ন করে তাদের দেওয়ালে তুলে রাখেন, সেই কথা ভেবে একটু চোখের জলও ফেলেছেন।

আর তৃতীয়জন, তপুর ছোটকাকা চিন্তামণি ঘোষাল। তাঁর কথা একটু বিশদে না বললে অন্যায় হবে। কারণ, তিনি ভারী বর্ণময় চরিত্র। তিনি একাধারে কবি, জ্যোতিষী ও হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। বেহালার শীলপাড়ায় একটা ছোট ঘর থেকে তিনি 'শ্রীফল' ছদ্মনামে একটা

কবিতার কাগজ বের করেন। ‘শ্রীজ্ঞানী (জুরাসিক)’ নামে কোষ্ঠিবিচার করেন এবং স্বনামে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। কবিতার কাগজটার নাম ‘বায়স’। তবে শ্রীফলের বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বায়সেরও প্রকাশনা অনিয়মিত হয়ে পড়ছে। এখন আর তপুর কাকার কবিতাটবিতা তেমন আসে না, মন পড়ে থাকে ব্যবসার দিকে, মানে হোমিওপ্যাথি আর হাত দেখার দিকে।

তবে চিন্তামণিবাবু প্রখর বুদ্ধিমান। বেহালা অঞ্চলে নিজের নাম ছড়াতে গেলে কীভাবে বিজ্ঞাপন দিতে হবে, তা তিনি ভালই জানতেন। তাই ভারতীয় টিম থেকে সৌরভ বাদ পড়ার পরদিনই তিনি বেহালা চৌরাস্তায় হ্যান্ডবিল ছড়ালেন। সেই হ্যান্ডবিলের এপিঠে ওপিঠে দু'টো বিজ্ঞাপন। এক দিকে ছিল—

‘সৌরভের লাগি, এভাবে কেঁদো না
খাও বেলেডোনা, ভুলবে বেদনা।
সকল প্রকার মানসিক ও শারীরিক সঙ্কটে আপনাদের সহায় ডক্টর চিন্তামণি ঘোষাল, ভিনি ভিডি-ভিসি...’ ইত্যাদি।

সেই একই হ্যান্ডবিলের আর-এক পিঠে ছাপা ছিল—

‘সকালবেলায় হাতে যদি ধরো
সিমলা-আপেল
বিকেলের আগে মুঠো খুলে পাবে
পোকা বেল।
রাহুর দশায় পড়ে গেছ তুমি,
হে গ্রেগ-চ্যাপেল
শ্রীজ্ঞানী (জুরাসিক) বলছে,
তোমরা ডাহা ফেল।
অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য আপনাদের ঘরের পাশেই বাক্‌সিদ্ধ তান্ত্রিক, শ্রীজ্ঞানী (জুরাসিক)... ইত্যাদি

এই ছোটকাকা সারাদিনই প্রায় বাড়ির বাইরে-বাইরে ঘোরেন। তাই তপুর রিসার্চ নিয়ে বাড়িতে যে মেঘ ঘনিয়েছে, তার খবর তিনি রাখতেন না। কিন্তু একদিন হঠাৎ কেমন করে তাঁর কানে গেল যে, তপু নাকি কাটা হাত-পা গজাবার হোমিওপ্যাথি ওষুধ বানাচ্ছে। তখনই তিনি পাড়া কাঁপিয়ে হাঃ-হাঃ করে একটা তান্ত্রিকসুলভ অট্টহাস্য করে বললেন, “আরে বাবা, তেমন ওষুধ যদি বানানোই যেত, তা হলে কী চিন্তামণি ঘোষাল সেটা না বানিয়ে রেখে দিত? যাই হোক, আমি দু'-চার দিনের মধ্যেই টিকটিকি আর মাকড়সার বিষের অ্যান্টিডোট বানিয়ে ফেলছি। তপু আর টমকে একডোজ করে খাইয়ে দেব। তারপর তপসে মাছের বড়ার মতো টিকটিকি ভেজে খেলেও ওদের কিছু হবে না। তোমরা আর চিন্তা কোরো না।

॥ ৫ ॥

তপু খুব মন খারাপ করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আর মাঝে-মাঝে একটা স্কেল দিয়ে টমের কাটা লেজটা মাপছিল। তিন দিন হয়ে গেল, টম ক্রমান্বয়ে টিকটিকি আর মাকড়সার হরমোনের গুলি খাচ্ছে। তবুও তার কাটা লেজ এক মিলিমিটারও বাড়েনি।

এই সময়ই হঠাৎ তপু শুনতে পেল ছোটকাকার সেই অট্টহাস্য আর ঘোষণা, “আমি দু'-চার দিনের মধ্যেই টিকটিকি আর মাকড়সার বিষের অ্যান্টিডোট বানিয়ে ফেলছি।”

বিদ্যুৎচমকের মতো একটা কথা তপুর মাথায় এল। সত্যি, এটা সে কেন এত দিন খেয়াল করেনি! সকলেই জানে, মাকড়সার বিষে মাকড়সা মরে না, টিকটিকির কামড়ে টিকটিকির ক্ষতি হয় না। কেন? কারণটা খুব সহজ। ওদের শরীরে শুধু বিষ নেই। সেই বিষের অ্যান্টিডোটও আছে। তপুর নিশ্চিত ধারণা হল, তার আবিষ্কৃত হরমোনের সঙ্গে এই অ্যান্টিডোটও ভূমিকা নেয় কাটা হাত-পা গজানোর ব্যাপারে। সে এত দিন বোকার মতো শুধু হরমোন নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছিল। তপু দৌড়ে গিয়ে জ্যাঠামশাইকে জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা জেঠুমণি, অ্যান্টিডোটের দেবতা কে?”

“দেবতা নন, দেবী।” গম্ভীরভাবে কপালে হাত ছোঁয়ালেন জ্যাঠামশাই, “দেবী সন্তবামী!”

তপুও কপালে হাত ছুঁইয়ে ভক্তিভরে মনে-মনে বলল, ‘মা সন্তবামী, ছোটকাকা যেন অ্যান্টিডোটটা ঠিকমতো বানাতে পারেন, দেখো।’

আশ্চর্যের ব্যাপার, পরদিন সকালেই উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছোটকাকা হাঁক পাড়লেন, “তপু, টম, অ্যান্টিডোট রেডি। খালি পেটে এক ডোজ, চলে এসো শিগগির।”

টম তার নাম শুনেই দৌড়ে যাচ্ছিল। তপু তার কান পাকড়ে মুখে বেশ বড় এক ডোজ নিজের বানানো বড়ি ঢেলে দিল। তারপর ‘দুর্গা’ বলে নিজেও খেয়ে নিল আট-দশটা। মুখটুখ মুছে ছোটকাকার সামনে গিয়ে ভাল ছেলের মতো হাঁ করে দাঁড়াল। সকলেই তো অবাক।

আর চিন্তামণিবাবুর সেই অ্যান্টিডোট যেই পেটে গিয়ে তপুর ওষুধের সঙ্গে মিশল, সঙ্গে-সঙ্গে তপু আর টমের চোখ জুড়ে এল ঘুম। শুধুই ঘুম, গভীর ঘুম। অন্য কিছু নয়। বাড়ির লোকরা ধরাধরি করে তপুকে তার ঘরে শুইয়ে দিল। টমকেও গুরুং পাঁজাকোলা করে নিয়ে শুইয়ে দিল সেই ঘরেরই মেঝেয়।

তপুর সেই ঘুম ভাঙল পরদিন ভোরে। টমের ডাকাডাকিতে। বাড়ির উঠোনে হুলোবিড়াল অভিমানীকে তাড়া করেছে টম। এখন টমের পিছনে দিব্যি একটা বড়সড় বাঁকানো লেজ। লেজের সঙ্গে-সঙ্গে তার ব্যক্তিত্বও ফিরে এসেছে।

তপু ঘুমজড়ানো চোখেই নিজের ডান হাতটা চোখের সামনে তুলে আনল। হ্যাঁ, আংটি পরার আঙুলটা, যেটা রকেট ওড়ানোর রাত্তিরে হারিয়ে গিয়েছিল, সেটা আবার ফিরে এসেছে। তপু তৃপ্তির হাসি হেসে পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

উপসংহার: প্রশ্ন উঠতে পারে, এমন যুগান্তকারী আবিষ্কার মানুষের কল্যাণে লাগানো হল না কেন?

ঘটনাটা হল, তপু তো একজন আদর্শ বিজ্ঞানীর মতোই তার ওষুধের ফরমুলা ডায়েরিতে লিখে রেখেছিল, কিন্তু চিন্তামণিবাবু কিছুতেই মনে করতে পারলেন না, কী কী মিশিয়ে তিনি অ্যান্টিডোটটা বানিয়েছিলেন। একবার আকাশে চেয়ে বললেন, “ন্যাজা-টু হান্ড্রেড, ট্যারান্টুলা-থার্টি, আর ইনফ্লুয়েঞ্জিনাম!” পরক্ষণেই চুল খামচে বিড়বিড় করলেন, “না, না। অ্যানথ্রাসিনাম, মার্কসল আর জ্যাট্রোফা বোধ হয়।”

যেহেতু দু'টো ওষুধ না মেশালে কাজ হবে না, তাই এ জগতে টম আর তপু ছাড়া আর কেউ এর উপকার পেল না।

তপুর অবশ্য তা নিয়ে খুব একটা দুঃখ নেই। সে এখন কেরোসিনচালিত কম্পিউটার আবিষ্কার করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

ছবি: অনুপ রায়

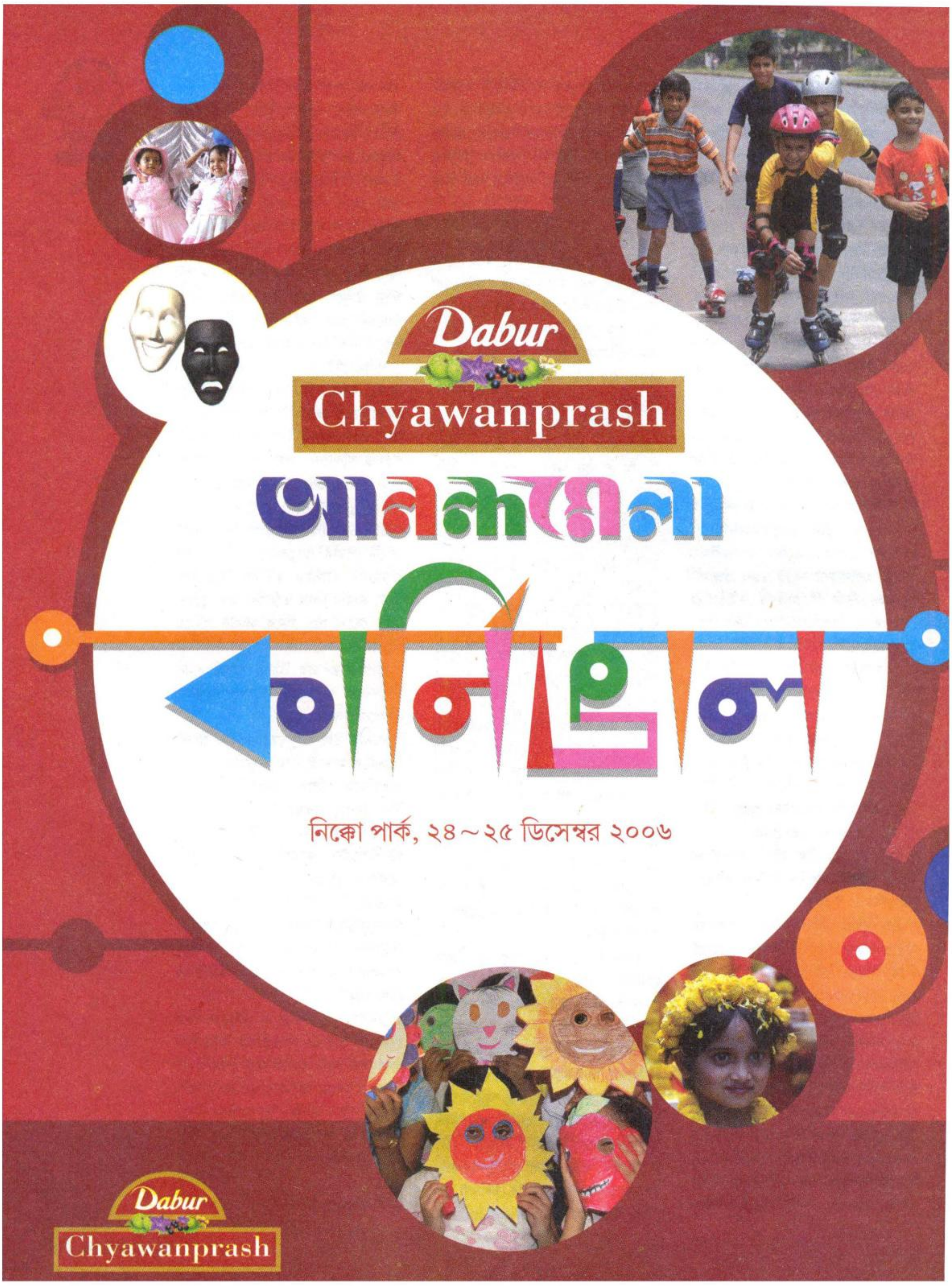
Dabur
Chyawanprash
আনন্দমেলা
কার্নিভাল
নিক্কো পার্ক, ২৪~২৫ ডিসেম্বর ২০০৬
Dabur
Chyawanprash

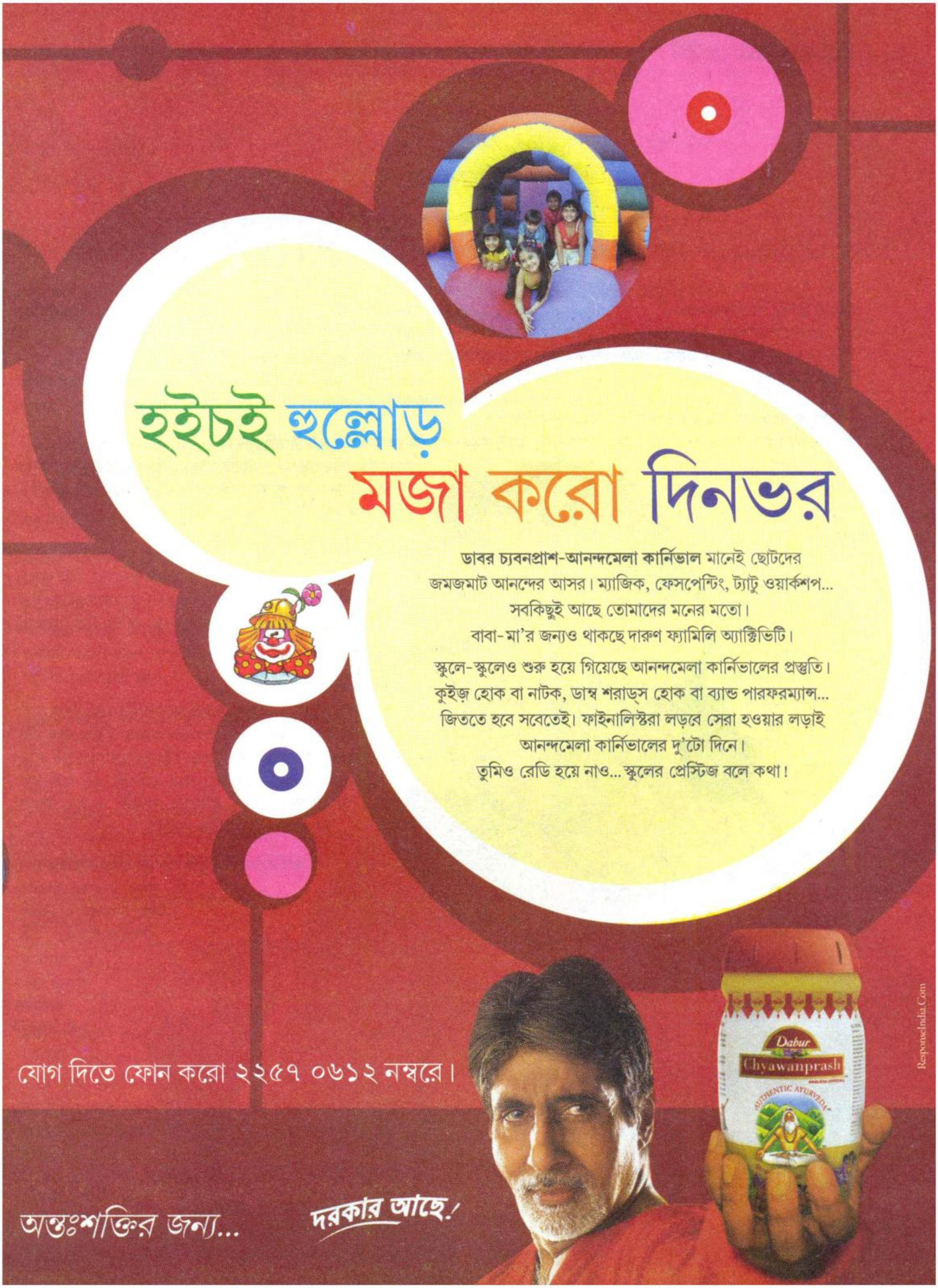

হইচই হুল্লোড়
মজা করো দিনভর
ডাবর চ্যবনপ্রাশ-আনন্দমেলা কার্নিভাল মানেই ছোটদের
জমজমাট আনন্দের আসর। ম্যাজিক, ফেসপেন্টিং, ট্যাটু ওয়ার্কশপ...
সবকিছুই আছে তোমাদের মনের মতো।
বাবা-মা'র জন্যও থাকছে দারুণ ফ্যামিলি অ্যাক্টিভিটি।
স্কুলে-স্কুলেও শুরু হয়ে গিয়েছে আনন্দমেলা কার্নিভালের প্রস্তুতি।
কুইজ় হোক বা নাটক, ডাম্ব শরাড্‌স হোক বা ব্যান্ড পারফরম্যান্স...
জিততে হবে সবেতেই। ফাইনালিস্টরা লড়বে সেরা হওয়ার লড়াই
আনন্দমেলা কার্নিভালের দু'টো দিনে।
তুমিও রেডি হয়ে নাও... স্কুলের প্রেস্টিজ বলে কথা!
যোগ দিতে ফোন করো ২২৫৭ ০৬১২ নম্বরে।
Dabur
Chyawanprash
AUTHENTIC AYURVEDA
ResponseIndia.Com
অন্তঃশক্তির জন্য...
দরকার আছে!

হাওড়ার চ্যাটার্জি হাট গার্লস স্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্রী। স্কুল আর পাড়ার ফাংশানে আরও পাঁচটি মেয়ের মতোই ওর নাম বাঁধা। সেখান থেকে সোজা মুম্বইয়ে প্লে-ব্যাক করার সুযোগ, সঙ্গে অনেক পুরস্কার। মুম্বই জয় করে আসার পর সা রে গা মা পা-র প্রথম 'লিট্‌ল চ্যাম্প' সঞ্চিতা ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলেছেন **রাই সেনগুপ্ত**

'লিট্‌ল চ্যাম্প' সঞ্চিতা

তোমার বাড়ির কথা কিছু বলো।

বাবা, মা, দাদা আর আমি। এঁরাই আমার সব। আমার পড়াশোনা, গান, নাচ সব দিকে সমান নজর থাকে ওঁদের। আমি ছোট বলে তার পুরো সুবিধেটা উপভোগ করি।

এত বড় ইভেন্টে নাম দেওয়ার উৎসাহ কার কাছ থেকে পেলে?

মজার ব্যাপার হল, 'সা রে গা মা পা লিটল চ্যাম্প' নামে একটা অনুষ্ঠান করছে সেটা আমি জানতামই না। কলকাতায় আমার এক জেঠুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ওখানে আমার এক দিদি (জানো তো, ও আমার দিদির মেয়ে মানে আমিই ওর মাসি হই, তবে বয়সে বড় বলে 'দিদি' বলেই ডাকি) বলল পরের দিন বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনে সা রে গা মা পা-র তরফ থেকে আট-চোদ্দ বছর বয়সিদের অডিশন নেওয়া হবে। তখনই ঠিক করলাম একবার গিয়ে দেখা যাক।

প্রথম দিন অডিশনের অভিজ্ঞতা বলো।

ওরে বাবা! অনেকে এসেছিল অডিশনের জন্য! বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনে অডিশন নেওয়া হয়েছিল।

কে তোমার অডিশন নিয়েছিলেন?

প্রথম বার গিয়েছিলাম আনন্দ শর্মার সামনে। তারপর দ্বিতীয়বার আবার ডাক পড়ে, তখনও আনন্দ শর্মাই ছিলেন। শেষ বার গান গাই অভিজিৎ ভট্টাচার্যের সামনে।

অডিশনের দিন কোন গানটা গেয়েছিলে?

মোট তিনটে গান গেয়েছিলাম। তেরে বিন (আ আব লৌট চলে), গুঁজি সি হ্যায় সারি ফিজা, য্যায় সে বাজতি হো স্যাহেনাইয়া (কিউ হো গ্যায়া না), দিল ক্যাহে রাহা হ্যায় তুম সে ইঁউ রিস্তা জোর লুঁ (কিঁউ কি)।

কারও কাছে গান শেখো?

ছেলেবেলা থেকে মা-বাবার কাছেই গান শিখছি। মা আর বাবা জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছে গান শিখেছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন সময় ওঁরা চিন্ময় লাহিড়ি, সুকুমার মিত্র, পূরবী দত্ত, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে তালিম নিয়েছেন। ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, ওঁরা গান কত ভালবাসেন। ওঁদের দু'জনের কাছেই আমার গানের হাতেখড়ি থেকে তালিম, সবকিছু।

ফাইনালের দিন তুমি তো খুব ভাল নেচেওছিলে?

হ্যাঁ, শমক দাভরের গ্রুপের সঙ্গে নেচেছিলাম। ওঁরাই শিখিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে আমার দাদা আমাকে খুবই সাহায্য করেছে।

সব সময় সঙ্গে ছিলেন দাদা

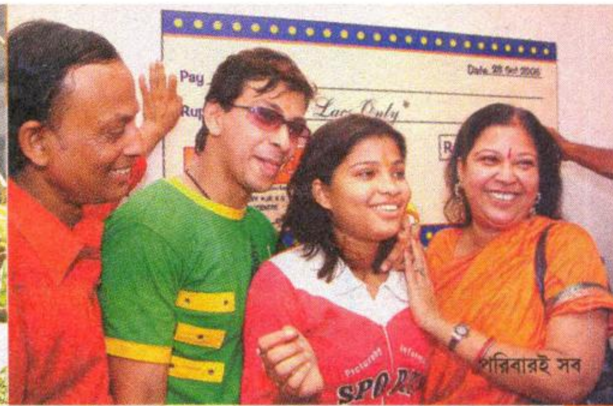

পরিবারেই সব

সব বিষয়েই বক্তব্য স্পষ্ট

পড়া আর গান দু'টোর জন্য ঠিকঠাক সময় বের করতে পার?

এখন আমার ক্লাস নাইন, তাই পড়ার চাপটা একটু বেশি। আর সময় ধরে রেওয়াজ করতে বসা আমার ধাতে নেই। তার জন্য বকাও খাই। তবে সারাদিনে যে-কোনও সময় আমি গান নিয়ে বসবই, সেটা রাতে হলেও।

স্কুলের ফাংশানে নিশ্চয়ই তোমার নাম ঠিক হয়ে থাকে?

স্কুলে গানের কোনও অনুষ্ঠান হলে সাধারণত আমি নাম দিই। পাড়াতেও একবার-দু'বার গান গেয়েছি। তবে এই অনুষ্ঠানে তো শুধু বাংলা গান গাইতে হয়, তাই ভাল লাগে না।

বন্ধুদের রিঅ্যাকশন কী রকম?

বন্ধুরা তো খুব খুশি। আমার বেস্ট ফ্রেন্ড শ্রীতমা চট্টোপাধ্যায় তো আছেই, তা ছাড়াও অন্তরা, পায়েল, এদের সকলকে নিয়ে আমাদের একটা গ্রুপও আছে। অনেকে আবার জিজ্ঞেস করছেন, আমি ওদের ভুলে যাব নাকি! আচ্ছা তুমিই বলো, বন্ধুদের কেউ ভুলে যায়!

মুম্বই শহরটাকে কেমন লাগল? নতুন বন্ধু, নতুন জায়গা কী রকম লেগেছে?

খুব সুন্দর আর খুব বড়। আমার মুম্বই শহরটা বেশ পছন্দ হয়ে গিয়েছে। লিট্‌ল চ্যাম্পে নেহা আর সমীরের সঙ্গে আমার খুব ভাল বন্ধুত্ব হয়। ওখানে আমরা সকলে মিলে খুব মজায় সময় কাটাতাম। তবে ওখানে মিস করতাম ফুচকা। ফিরে আসার পর গিয়ে খেতে পারিনি বটে, তবে বাড়িতেই আনিয়ে খেয়েছি।

তোমাদের তো নিশ্চয়ই গ্রুমিং সেশন ছিল। কারা তোমাদের ক্লাস নিতেন?

আনন্দ শর্মা, অনুজ কপূর, যতিন্দর আনন্দ আমাদের ক্লাস নিতেন। আমি ছেলেবেলা থেকে ধ্রুপদী সঙ্গীত শিখেছি, তবুও ওঁরা বারবার শুদ্ধ হিন্দি উচ্চারণের উপর নজর রাখতেন।

লতাজির সঙ্গে দেখা হওয়ার অভিজ্ঞতা তো অনেক বড় ব্যাপার! কেমন লাগল?

সত্যি আমি কোনও দিন ভাবিনি যে, লতাজির সঙ্গে সামনা-সামনি দেখা হবে! উনি কত বড় মানুষ কিন্তু কী ভাল! আমাদের আশীর্বাদ করে বলেছেন যে, এটা একটা ধাপ, আমাদের আরও অনেক দূর যেতে হবে।

তোমার আইডল কে?

আমি ছোটবেলা থেকে আমার মায়ের মতোই হতে চাই। গানের জগতে আমার আইডল একজন নয়, চারজন, লতাজি, আশাজি, অলকা যাজ্ঞিক আর সুনীধি চৌহান।

লিট্‌ল চ্যাম্প হওয়ার পর জীবন কতটা বদলে গিয়েছে?

এতটুকুও বদলায়নি। আমি আগেও যেরকম ছিলাম, এখনও সেরকমই আছি। সকলে শুধু ভাবছে আমি বুঝি বদলে যাব।

ভবিষ্যতের কথা কিছু ভেবেছ? পড়াশোনা আর গান, কোনটাকে বেশি প্রাধান্য দেবে?

না, সেভাবে কিছু ভাবিনি। গানই আমার কাছে আগে। গানই যে আমার কেরিয়ার তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। তবে এখন তো আমার ক্লাস নাইন, তাই পড়াশোনাটাও চালিয়ে যেতে হবে।

তোমার অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট নিশ্চয়ই গান?

না, না। আমাদের স্কুলে তো গান অ্যাডিশনাল নেই। থাকলে নিতাম নিশ্চয়ই।

কোনও সিনেমা বা মিউজ়িক ভিডিওর অফার পেয়েছ?

বাপি লাহিড়ি বলেছেন, তাঁর পরের সিনেমায় আমাকে দিয়ে গান গাওয়াবেন।

বন্ধু থেকে আত্মীয়স্বজন সকলের চোখেই তুমি এখন আলাদা, তফাতটা টের পাচ্ছ?

আমি এমনিতেই খুব আদুরে। এখন আদরটা আর একটু বেড়ে গিয়েছে।

অন্য কেউ লিট্‌ল চ্যাম্প হলে খুব দুঃখ হত নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ, তবে সে যদি বাঙালি হত, তবে দুঃখ কিছুটা কম হত।

ফোটো: প্রদীপ আদক

সময় ধরে রেওয়াজ করতে বসা আমার ধাতে নেই। তবে সারাদিনে যে-কোনও সময় আমি গান নিয়ে বসবই, সেটা রাতে হলেও।

লিট্‌ল চ্যাম্প ট্রোফি হাতে সঙ্ঘিতা

অমিল খোঁজো

তফাত বোঝো

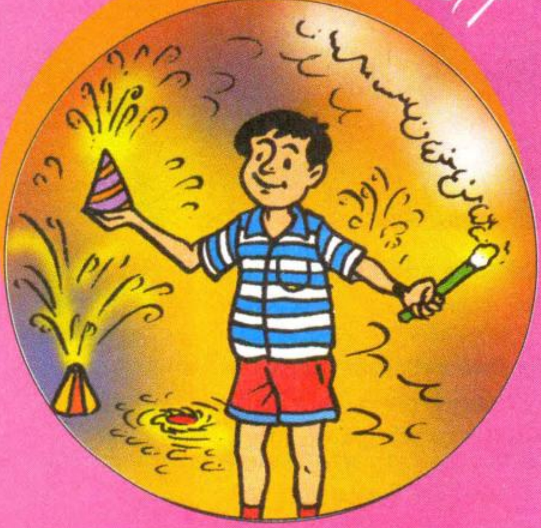

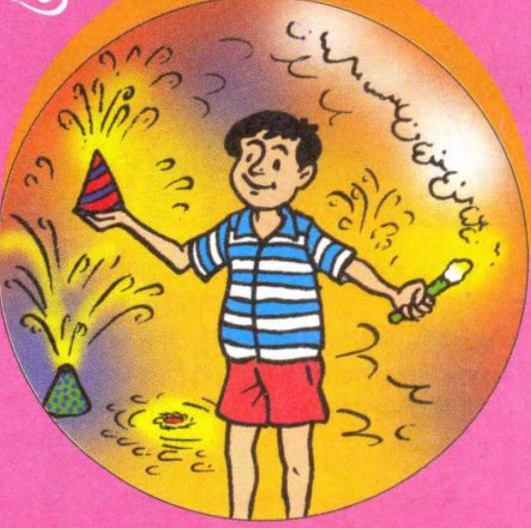

উপরের এই ছবি দু'টি দেখতে একই রকম। কিন্তু ঠিকমতো খুঁজলে পাওয়া যাবে অন্তত আটটি অমিল। খুঁজে বের করতে পারাটাই মজা। আড়চোখে আগেভাগে উত্তর দেখো না কিন্তু! উত্তর ডান দিকের পাতায়। *ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়*

হাসছি দ্যাখো

রিঙ্কিকে তার ঠাকুরমা গল্প শোনাতে-শোনাতে বললেন, "সব কিছুই ভগবান তৈরি করেছেন।"
রিঙ্কি জিজ্ঞেস করল, "তোমাকেও ভগবান তৈরি করেছেন?"
ঠাকুরমা বললেন, "হ্যাঁ।"
রিঙ্কি বেশ কিছুক্ষণ পর ঠাকুরমার কাছে ফিরে এল। এতক্ষণ সে নিজের ঘরের আয়নায় ঘুরেফিরে নিজেকে দেখে এসেছে। আবার সে ঠাকুরমাকে প্রশ্ন করল, "আমাকেও ভগবান তৈরি করেছেন?"
ঠাকুরমা হেসে বললেন, "হ্যাঁ সোনা, আমাকে, তোমার বাবা-মাকে, তোমাকে, সকলকেই ভগবান তৈরি করেছেন।"
রিঙ্কি বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল, "ভগবান ঠিক আমার মতো।"
ঠাকুরমা খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "মানে?"
রিঙ্কি সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল, "স্কুলে দিদিমণি বলেছেন আমি ক্রমশ উন্নতি করছি। সে রকম ভগবানও আমাদের তৈরি করার সময় ক্রমশ উন্নতি করেছেন।"

একজন খুব বড় নেতা মারা গিয়েছেন। চিত্রগুপ্ত তাঁকে ডেকে বললেন, "আপনার মতো নামী মানুষদের জন্য একটা বিশেষ সুযোগ আছে। আপনি একদিন নরকে আর একদিন স্বর্গে কাটিয়ে দেখুন। যেখানে আপনার ভাল লাগবে, সেখানেই আপনি বাকি দিনগুলো কাটাবেন।"
প্রথম দিন চিত্রগুপ্ত তাঁকে নরকের দরজা অবধি পৌঁছে দিলেন। নেতাটি দেখলেন তাঁর সব সঙ্গীই সেখানে রয়েছে। তারা ভাল জামাকাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারদিকে ভাল-ভাল খাবার সাজানো রয়েছে। বেশ জমজমাট পরিবেশ। পার্টি শেষ হওয়ার মুখে যম নিজে হাজির হয়ে, নানারকম মজার কথায় মাতিয়ে দিলেন। সারাদিন কোথা দিয়ে কেটে গেল নেতাটি বুঝতেও পারলেন না।
পরের দিন চিত্রগুপ্ত তাঁকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। নেতাটি দেখলেন সেখানে সকলে বেশ খুশি-খুশি মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক এমন লোকের সঙ্গে তাঁর দেখা হল, যাদের পৃথিবী-জীবনে তাঁর বোকা বলেই মনে হত। সারাদিন প্রকৃতির কোলে শান্তিতেই কেটে গেল তাঁর। পরের দিন চিত্রগুপ্ত তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কোথায় যেতে চান। তখন নেতাটি বললেন, "স্বর্গের পরিবেশ খুবই শান্তিপূর্ণ তবে নরকের মতো মজাদার নয়, তাই আমি নরকেই যেতে চাই।"
চিত্রগুপ্ত আবার তাঁকে নরকের দরজা অবধি পৌঁছে দিলেন। দরজা খোলার পর নেতাটি দেখলেন, চারদিক ময়লায় ভরতি আর তাঁর সঙ্গীরা নোংরা ছেঁড়া জামাকাপড় পরে সেই ময়লা পরিষ্কার করছে। একটা উঁচু জায়গায় যম চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। নেতাটি অবাক হয়ে যমের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার? পরশু তো এখানকার পরিবেশ একেবারে অন্যরকম ছিল?"
যম তখন কাষ্ঠ হেসে জবাব দিলেন, "পরশু আমরা প্রচার করছিলাম, তাই আজ তুমি আমাদের ভোট দিয়েছ।"

অর্থ শেখো

শব্দের একদম সঠিক অর্থ জানার মধ্যেই রয়েছে আনন্দ। চেনা-অচেনা সব শব্দেরই প্রকৃত অর্থ জানা উচিত। নীচের শব্দগুলোর পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে তাতে দাগ দেবে।

ভণ্ডুল: (১) ভণ্ড স্বভাব। (২) যে সহজেই ভেঙে যায়। (৩) পণ্ড। (৪) এলোমেলো।

ভ্যাবাচাকা: (১) বিস্মিত হওয়া। (২) হতবুদ্ধি বা বিহ্বল অবস্থা। (৩) ত্রস্ত বা ভীত হওয়া। (৪) বোকা বনে যাওয়া।

বিজৃম্ভন: (১) হাই তোলা। (২) আঙুল মটকানো। (৩) ঢেকুর তোলা। (৪) ঘাড় চুলকনো।

দাবদাহ: (১) মড়া পড়ানো। (২) বনের আগুন। (৩) অগ্ন্যুৎপাত। (৪) অগ্নিকর্ম।

অভিসন্ধি: (১) পরিকল্পনা। (২) অভিরুচি। (৩) যুদ্ধ শেষ হলে দুই পক্ষের সুষ্ঠু মিটমাট। (৪) গোপন ইচ্ছে।

গত সংখ্যার উত্তর

মলমাস: (৩) যে-মাসে শুভকাজ নিষিদ্ধ। যেমন- 'বাবা বলেছেন এটা মলমাস। ক'টা দিন যাক।' (বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়)

তবিয়ত: (৩) শারীরিক অবস্থা। যেমন- 'সে গম্ভীরভাবে বলিল, বাবুর তবিয়ত আচ্ছা নেই।' (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

কাতার: (১) দল। 'কত লোক বসে আছে কাতার দিয়ে।' (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)

ভজকট: (২) জটিল ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। যেমন- 'সাক্ষী চাই, রসিদ চাই, উকিল মোক্তার আমিন হাকিম, কী ভজকট ব্যাপার!' (বুদ্ধদেব বসু)

ঝকমারি: (৩) ঝামেলা। যেমন- 'ওষুধ আনাও এক ঝকমারি কাজ।' (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়)

স্কন্দগুপ্ত

অমিল খোঁজো, তফাত বোঝোর উত্তর

১. ছেলেটির হাতের তুবড়িটার রং আলাদা। ২. ছেলেটির জামায় পকেট নেই। ৩. প্যান্টের ডিজাইন আলাদা। ৪. ছেলেটির মোজার অংশ দেখা যাচ্ছে না। ৫. নীচের তুবড়িটার ডিজাইন পালটে গিয়েছে। ৬. ছেলেটির হাতের রংমশালটা ছোট। ৭. নীচের চরকিটা ছোট। ৮. ছেলেটির হাতে ঘড়ি নেই।

সংকেত: পাশাপাশি

(১) বিভিন্ন তরিতরকারির সংমিশ্রণে রান্না করা খিচুড়ি। (৪) যে তবলা বাজায়। (৬) মামিমা। (৮) ক্ষমতা, উৎকৃষ্ট। (১০) সমুদ্র বা বড় নদীর তীরে জাহাজ নোঙর করার স্থান। (১১) শ্রীকৃষ্ণের ঘরোয়া নাম। (১২) দৃঢ়, দুঃসহ, রুক্ষ। (১৩) মেঘাচ্ছন্ন। (১৫) অত্যন্ত বেঁটে লোক। (১৭) মলিন। (১৮) সাহায্য, সহযোগিতা। (১৯) অশান্ত। (২০) যে রাতে দেখতে পায় না। (২১) শ্রীকৃষ্ণ।

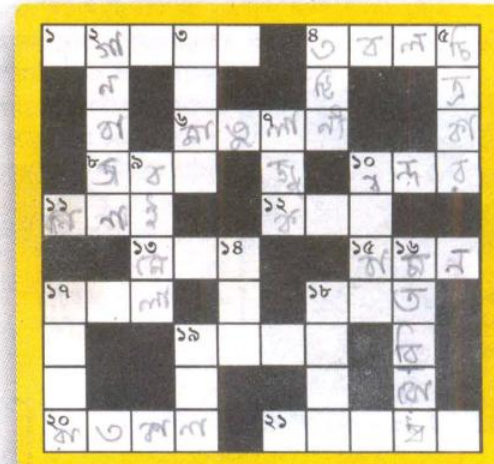

সংকেত: উপর-নীচ

(২) জলসাঘর থেকে ____ -র শব্দ ভেসে আসছে। (৩) টুকরো-টুকরো করে ভাঙা। (৪) নদী। (৫) যে ছবি আঁকে। (৭) মুখচোরা, লজ্জাশীল। (৯) কলকাতার বই কেনা-বেচার উৎসব। (১০) একেবারে নষ্ট, বাতিল। (১৪) যত্নে পালন করা হয়েছে এমন। (১৬) মতের অমিল। (১৭) বিষণ্ণ, বিষাদগ্রস্ত। (১৮) ফিনফিনে পাতলা সুতোর কাপড়। (১৯) অন্যমনস্ক, আনমনা।

দেবসেনাপতি

		আ	য়ো	জ	ন		অ	ভা	ব
ক	ঠি	ন		ল			বা		চ
গি		চা	ম	চ		লো	ক	সা	ন
কা	ন	ন		র	জ	ক			
	বী		চা			জ	বা	ব	
	ন	ক	ল			ন		দ	
			বা	লি	কা		জা	ন	লা
খ	গ	রা	জ		ন	র	ম		জু
ব		খা			কা		বা	দ	ক
র	সা	ল		ছো	টা	ছু	টি		

নানা রঙের রামধনু

সার্চ ফর দ্য গ্রেট শার্কস

হাঙর সম্বন্ধে কতটুকু জানি আমরা? নামটা শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ভয়ংকর এক সামুদ্রিক প্রাণী। কিন্তু এই প্রাণীর আর-একটা পরিচয় তো একেবারেই অজানা আমাদের কাছে। বিশাল এই প্রাণী যে কতটা আকর্ষক এবং বুদ্ধিমান, আর এদের বশ মানানোও যে খুব একটা কষ্টকর নয়, তা জানা যাবে কলকাতায় সায়েন্স সিটির অ্যাস্ট্রোভিশন শো 'সার্চ ফর দ্য গ্রেট শার্কস' দেখলে। কীভাবে সমুদ্রের গভীরে ব্লু শার্ক, ৪০ ফুট লম্বা হোয়েল শার্ক বা হোয়াইট শার্ক-এর মুখোমুখি হচ্ছেন অভিযাত্রীরা, তা দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। সপ্তাহে প্রতিদিন পাঁচটি শো দেখানো হয়। প্রতিটি শো-এর সময়সীমা ৪০ মিনিট। শো শুরু সকাল সাড়ে এগারোটায়, সন্ধে সাড়ে ছ'টায় শেষ শো। সায়েন্স সিটির এন্ট্রি ফি ২০ টাকা, আর অ্যাস্ট্রোভিশন শো-এর জন্য ৪০ টাকা। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য টিকিটের দামে রয়েছে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা। সার্চ ফর দ্য গ্রেট শার্কস চলবে ২০০৭ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত।

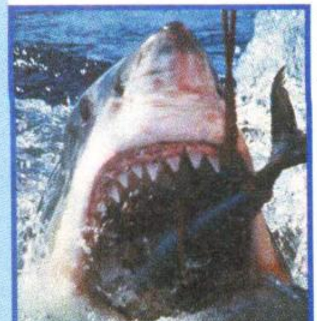

'অন্তরীক্ষ'-এ ভাল-মন্দের লড়াই

২ অক্টোবর থেকে স্টার প্লাসে শুরু হয়েছে 'অন্তরীক্ষ'। ভাল আর খারাপের সেই পুরনো দ্বন্দ্ব নিয়ে এক নতুন লড়াই। তবে এই লড়াই চলে মহাকাশে। রাজকুমার অমর, রাজা শালিয়ন আর রানি রিলিয়ার বড় ছেলে। নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সে খুবই সজাগ। গ্রহ ইরসিলিয়ার রাজকুমারী শলিয়াও প্রাপ্তবয়স্ক (তাঁর বয়স পঞ্চাশ! পৃথিবীর হিসেবে অবশ্য একুশ) হয়েছেন। আর আছে এক বিফল গবেষণার ফল শয়তানের আর-এক রূপ 'রণকাল'। রাজকুমার অমর কি পারবে রণকাল আর তার বাহিনীকে শেষ করতে? জানতে হলে সোম থেকে বৃহস্পতিবার রাত আটটায় চোখ রাখো টিভির পরদায়।

ক্রসওয়ার্ড-এর আয়োজন

ছোটদের জন্য বিশেষ দিন, শিশুদিবস। এই দিন 'ক্রসওয়ার্ড বুকস্টোর' শুধু ছোটদের জন্যই আয়োজন করেছিল 'ট্যাটু আর্ট সেশন' আর ম্যাজিক শো। ট্যাটু যে আজকের ছোটদের মধ্যে কতটা জনপ্রিয় তা তাদের উৎসাহ দেখে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছিল। এরপর ছিল জাদুকর দিলীপ কুমারের ম্যাজিক শো। সব শেষে ছিল টিন রক ব্যান্ড 'দ্য গ্রাসহপারস'-এর দুর্দান্ত পারফরম্যান্স।

বই

এই তিতাস আর সেই তিতাসের গল্প

বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী

কৃষ্ণনগর, নতুন পল্লি
আগরতলা- ১, ত্রিপুরা
দাম: ১০০ টাকা

তিতাস তিতাস, আড়মাছ, পাতার বাঁশি, কাঠি লজেন্স, ভূত নয় অদ্ভুত, মেলার ভিড়ে, মাখনকাকু, এবং কানুদা, কাঁটালদা, মাছ ধরতে গিয়ে গল্পগুলো পড়তে ভাল লাগে, ছাড়তে মন চায় না।

হাসি গোয়েন্দা ডট কম

রণজিৎ মিত্র

পত্রলেখা
৯/৩ টেমার লেন
কলকাতা- ৭০০ ০০৯
দাম: ৩০ টাকা

মন ভাল করে দেওয়া ছোট্ট-ছোট্ট অনেক গল্প। মিলুমামা, গুন্ডা হাতির মুখোমুখি, শশীবাবুর পোষা ভূত, গোয়েন্দা কুকুর গল্পগুলো বেশ ভাল।

তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

একুশ শতক
১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা- ৭০০ ০৭৩
দাম: ৩২ টাকা

'তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা/কোলা ব্যাঙের ছা/খায় দায় গান গায়/তাই রে না রে না!'

তন্তুবায়ের ছেলে আশুর জীবনের কথা, ভাল লাগার কথা, সুখ-দুঃখের কথা। পিতৃবিয়োগের পর সংসারের হারানো মনোবল ফিরিয়ে আনে সে।

টাপুর টুপুর

স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এম ব্যানার্জি
১১৫ রজনীবাবু রোড
কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা
দাম: আট টাকা

ছড়াগুলোয় অনেক ক্ষেত্রেই জোর করে মিল দেওয়া হয়েছে। শব্দের প্রয়োগ ঠিকঠাক নয়। ছড়াগুলোর মজা পাঠককে টানে না। তবে কিছু ছড়া পড়তে ভাল লাগে।

ক্যাসেট

তাইরে নাইরে নাইরে না

ভাবনা, ৪০ টাকা

ছোটবেলার কিছু গানকে আবার মনে করিয়ে দিয়েছেন স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত। সঙ্গে আছে বেশ কিছু কুচোকাঁচাও। সোহম, দ্বৈপায়ন, ঐন্দ্রিলা (মিমি), সুপর্ণা, অভিজ্ঞা, শ্রেষ্ঠা, ঐন্দ্রিলা, তিতাস, সায়রী, সুহা, মৈত্রীদের গান শুনতে ভালই লাগে।

ঝিঙে ফুল

ভাবনা, ৪০ টাকা

ঝিঙে ফুল, খুকি ও কাঠবেড়ালি, মা, প্রভাতী, গরিবের ব্যথা, তালগাছ, চিঠি, খোকার বুদ্ধি'র মতো নজরুল ইসলামের জনপ্রিয় বেশ কিছু কবিতা আছে এই সংকলনটিতে।

বন্ধুদের কথা ভেবে

বন্ধুদের নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য কার্ড তো তোমরা সকলেই কেনো। এবার সেই কার্ড কিনেই সাহায্য করতে পার আরও এমন অনেক বন্ধুদের, যাদের কাছে তোমার পাঠানো সামান্য সাহায্যই অনেক দামী। আই টি সি লিমিটেড-এর গ্রিটিং কার্ড, ডেস্ক ক্যালেন্ডার ও অন্যান্য সমগ্রী কিনলে তার একটা অংশ চলে যাবে এস ও এস চিলড্রেন্স ভিলেজেস অফ ইন্ডিয়ার কাছে। আর সেখান থেকে গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে। পাওয়া যাচ্ছে ৩০০ টাকা দামের একটি বিশেষ গ্রিটিংস কার্ডের বাক্সও, তাতে আছে ১৫টি বড় কার্ড আর পাঁচটি ছোট কার্ড। এবার বড়দিনে বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানানোর সঙ্গে-সঙ্গে একটু আনন্দ থাক এই সব শিশুদের জন্যও।

সারাটা দিন ছোটদের

১১ নভেম্বর কলকাতার ৩০টি স্কুল একসঙ্গে হাজির হয়েছিল নিকোপার্কে। এ পি জে, অক্সিলিয়ম কনভেন্ট, বি ডি মেমোরিয়াল, বাগবাজার মাল্টিপারপাস, বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন, বেথুন, ভারতীয় বিদ্যাভবন, বিধাননগর গভর্নমেন্ট, দিল্লি পাবলিক স্কুল, ডন বস্কো পার্ক সার্কাস, হরিয়ানা বিদ্যামন্দির, হোলি চাইল্ড গার্লস হাই স্কুল, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, যোধপুর পার্ক বয়েজ, যোধপুর পার্ক গার্লস, জুলিয়ান ডে গঙ্গানগর, লক্ষ্মীপত সিংঘানিয়া এসি, মহাদেবী বিড়লা, নব নালন্দা, পাঠভবন, স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল, সাখাওয়াত মেমোরিয়াল, শ্রীশিক্ষায়তন এবং ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে 'সঙ্গীত বাংলা' টিভি চ্যানেল এক মজার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। কুইজ়, নাচ, গান, আবৃত্তি- সকলেই নিজেদের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পেয়েছে এখানে। শিশু দিবসে সঙ্গীত বাংলার সারাদিনটাই ছিল ছোটদের জন্য।

ফোটো: প্রদীপ আদক

ক্যাপ্টেন হাঙ্গামা

যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ছোটদের বিশেষ মতামত থাকে। আর ছোটদের জন্যই যখন সব অনুষ্ঠান। তাই তাদের মতামতই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে এ তো জানা কথা। তবে 'হাঙ্গামা টিভি' তাদের একেবারে বসিয়ে দিয়েছে চালকের আসনে। প্রতি বছর বিভিন্ন শহর থেকে হাঙ্গামা টিভি বেছে নেয় একজন করে ক্যাপ্টেন। হাঙ্গামার কোন অনুষ্ঠান কেমন লাগছে বা অন্য চ্যানেলের কোন অনুষ্ঠান অনেক বেশি জনপ্রিয়, সব খবরই থাকে ক্যাপ্টেনের কাছে। প্রতি মাসে এদের পাঠানো রিপোর্ট থেকেই মুম্বইয়ের হেড অফিসে পৌঁছে যায় খুঁটিনাটি সব তথ্য। এ বছর 'পার্লে জি হাঙ্গামা টিভি ক্যাপ্টেন'-তলাশের ফাইনাল হবে মুম্বইয়ে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। কলকাতা থেকে কয়েক হাজার প্রতিযোগীর মধ্যে থেকে নির্বাচিত হয়েছে শ্রীশিক্ষায়তন স্কুলের দুই ছাত্রী স্নেহা চক্রবর্তী ও কশিশ অরোরা (উপরের ছবিতে)। এখন অপেক্ষা শুধু ফাইনালের।

নতুন ফেলুদা

জয়সলমির থেকে বেনারস, সবখানেই ফেলুদার জয়জয়কার। ফেলুদা আবার নতুন মিশনে, তবে এবার বিগ ৯২.৭ এফ এম-এ। নভেম্বরের সপ্তাহভর প্রাক্তন ফেলুদা ও বর্তমান ফেলুদা অর্থাৎ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় থেকে সব্যসাচী চক্রবর্তী সকলেই হাজির ছিলেন স্টুডিওয়। টিভির চাপে ছোটরা যখন রেডিওকে প্রায় ভুলতেই বসেছে, তখন বিগ এফ এম-এর এই পদক্ষেপ প্রশংসনীয়।

পড়াশোনা এবার সকলের জন্য

সার্ফ ও হিন্দুস্তান লিভার যৌথভাবে পিছিয়ে পড়া শিশুদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল। সার্ফ এক্সেলের প্যাকেটে পাওয়া যাচ্ছে এক টুকরো কাপড় যা ধুলেই ফুটে উঠবে এক থেকে দশের মধ্যে যে-কোনও একটি সংখ্যা। সেই সংখ্যাটি ৪৫৫ নম্বরে এস এম এস করলে সার্ফ সেই সংখ্যাটির মূল্য জমা করে দেবে 'উদয়ন' নামে এক বেসরকারি সংস্থাকে। কলকাতার দুস্থ ও অবহেলিত শিশুদের পড়াশোনার কাজে খরচ করা হবে এই অর্থ।

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তীর চাঞ্চল্যকর সৃষ্টি
রেনকোজির ভস্ম-রহস্য - ২৫ টাকা
(মুখার্জী কমিশন এই গ্রন্থের জন্যই লেখককে ডেকেছিল। বিমান দুর্ঘটনা হয়নি। নেতাজির মৃত্যু হয়নি। তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখানো হয়েছে। আসলে কী হয়েছিল?)
সুভাষ ও এমিলি (বিবাহ রহস্য) - ৩০ টাকা
(নেতাজির বিয়ে হয়নি। সবটাই ধাপ্পা। টাকায় কী না হয়! নেহরু - কৃষ্ণা বসুদের চক্রান্ত। কীভাবে চক্রান্ত হয়েছিল? টিভি মিডিয়া এই গ্রন্থের সাহায্য নিচ্ছে। রহস্যেভরা গ্রন্থ।)
প্রাপ্তিস্থান: দে বুক স্টোর ও আদিনাথ ব্রাদার্স

সব ধরনের প্রতিযোগিতায় একান্ত অপরিহার্য
বাংলা ভাষায় একখণ্ডে বৃহত্তম কুইজের বই
কুইজ ১১১১১
বিভিন্ন বিষয়ে ১১১১১ টি
আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তরের বিপুল সম্ভার,
অজস্র রঙিন ও সাদা-কালো ছবিসহ
চমৎকার বোর্ড বাঁধাই।
দাম ১৬০ টাকা
অক্ষয় মালঞ্চ
বি-৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭, ☎ ৬৫১০-৭৩৩০

বেতালসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য আমাদের কল্পলোকের রাজা। আর তাঁকে নিয়েই এই রমণীয় গল্প-সম্ভার—
কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় • দাম ৫০
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস • ফোন: ২২৪৪-৫৯২৪, ২২২৭-২৩৩৬
পাবেন: দে বুক স্টোর, বুক ফ্রেন্ড, আদি নাথ ব্রাদার্স, চক্রবর্তী-চ্যাটার্জি, মনীষায়

ইউরোপিয়ান গল্‌ফের মানচিত্রে তিনিই প্রথম খেতাবজয়ী এশীয়। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে পুরস্কার হিসেবে পেয়েছেন সবচেয়ে বেশি অর্থ। জীব মিলখা সিংহকে নিয়ে লিখেছেন **শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়**

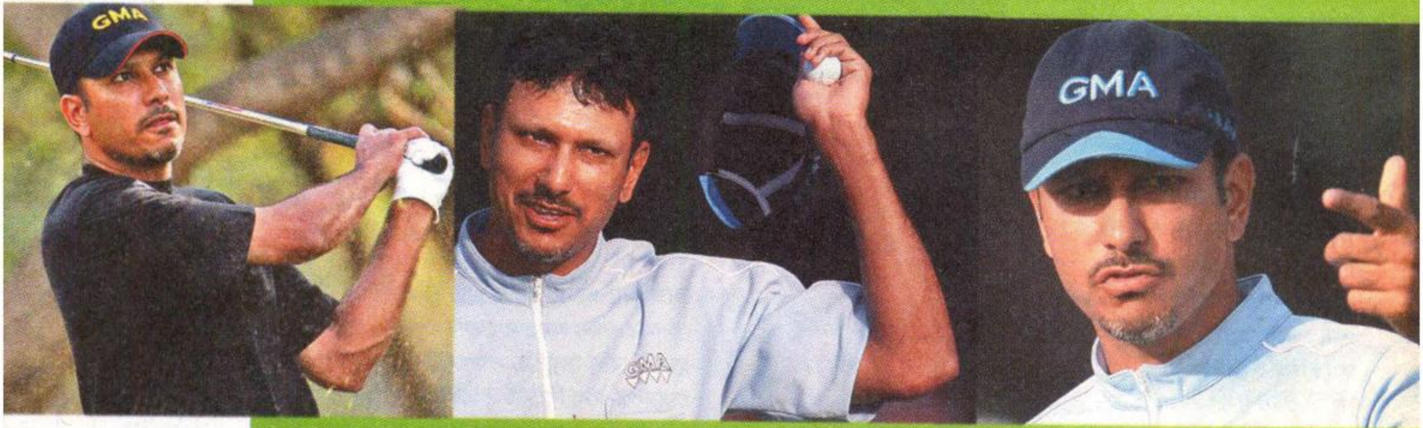

গ ল্‌ ফ

নতুন তারকা জীব মিলখা সিংহ

বাবা বিখ্যাত অ্যাথলিট, মা ভারতীয় ভলিবল টিমের প্রাক্তন অধিনায়ক। এঁদের ছেলে যে খেলোয়াড়ই হবে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু মিলখা সিংহ এবং নির্মল কৌর-এর ছেলে জীব মিলখা সিংহ বেছে নেননি ভলিবল কিংবা অ্যাথলেটিক্স। ন'-দশ বছর বয়স থেকেই তাঁকে টানত অন্য একটি খেলা। তাই সুযোগ পেলেই আর্মি অফিসারদের সঙ্গে ভিড়ে যেতেন গলফের খুঁটিনাটি বোঝার জন্য। এই উৎসাহে আর ভাটা পড়েনি। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি প্রথম অপেশাদার গলফ টুর্নামেন্ট আমেরিকান এক্সপ্রেস চ্যাম্পিয়নশিপ জেতেন দিল্লিতে। ১৯৯৩ সালে জীব মিলখা সিংহ আমেরিকা থেকে গলফেই গ্র্যাজুয়েশন করেন। সেই বছরেই সাদার্ন ওকলাহামা স্টেট ওপেন জেতেন তিনি। ১৯৯৪-এ দক্ষিণ কোরিয়ার একটি টুর্নামেন্টেও জয়ী হন জীব। এর পর শুধুই এগিয়ে চলা। খেতাবের ঝুলি ভর্তি হতে থাকে বিভিন্ন পুরস্কারে। তবে প্রতিটি জয়ই আসে আমাদের মহাদেশের মাটিতে। বিদেশের কোনও সম্মান তখনও ছিল অধরা। কিন্তু ছবিটা বদলে যায় ২০০৬-এ।

জীব মিলখা ভলভো চায়না ওপেনে (এই খেলাটা ইউরোপিয়ান এবং এশিয়ান টুরের ছাড়পত্র পেয়েছে) জয়ী হন এবং গত অক্টোবরে প্রথম এশীয় খেলোয়াড় হিসেবে স্পেনের মাটিতে জিতে নেন ভলভো মাস্টার্স খেতাব। গল্‌ফের দুনিয়ায় ভলভো পি জি এ টুরের সঙ্গে এক সারিতেই বসে এবং পুরস্কার হিসেবে যা অর্থমূল্য দেওয়া হয়, তা একেবারে তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতোই। জীব মিলখা পেয়েছেন প্রায় চার কোটি টাকা! অবশ্য ৩৫ বছরের এই গল্‌ফার টাকার চেয়ে জেতার গৌরবকেই অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। এখানেই শেষ নয়! সম্প্রতি হংকং ওপেনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে পেলেন অর্ডার অফ মেরিট খেতাব। এটাও মস্ত সম্মান। এরকম সব জয়ের পরও তিনি যেন খানিকটা হতাশই। কারণ, জনপ্রিয় খেলার তালিকায় এখনও গল্‌ফের কোনও স্থানই নেই। এর জন্য জীব মিলখা দায়ী করছেন ক্রিকেট, ফুটবল নিয়ে মেতে থাকা স্পোর্টস চ্যানেল এবং মিডিয়াকেই। তবে তাঁকে সামনে রেখে অনেক ভারতীয়ই এখন এগিয়ে আসছেন পেশাদার গল্‌ফ খেলতে। অর্জুন অটওয়াল, জ্যোতি রনধাওয়ার মতো গল্‌ফারদের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে জীবের দুরন্ত পারফরম্যান্স। আর-এক ভারতীয় শিব কপুরও গত বছর পেয়েছেন ভলভো মাস্টার্স অফ এশিয়া খেতাব। জীব নিজেও মনে করেন ভারতে প্রতিভাবান গল্‌ফ খেলোয়াড়ের কোনও অভাব নেই। শুধু প্রয়োজন আর-একটু প্রচারের, এমনকী ভাল খেলোয়াড় পাওয়ার জন্য দেশে গল্‌ফ অ্যাকাডেমি খোলাও জরুরি। ভলভো খেতাবের পর জীবের চোখে আরও বড় স্বপ্ন, ব্রিটিশ ওপেন এবং ইউ এস মাস্টার্স জেতা! এবং এই লক্ষ্যপূরণের জন্য তিনি যে কতখানি নিষ্ঠাবান, সেটা তাঁর একটি সাক্ষাৎকার থেকেই বোঝা যায়। জীব বলছেন, "বিশ্বাস করুন, আমি প্রতিদিন আট ঘণ্টা প্র্যাকটিস করি। কোনও রোববার নেই, ছুটির দিন বলেও কিছু নেই। শুধু জানি পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই।" এমন দৃঢ়তা না থাকলে ১০৪ র‍্যাঙ্ক থেকে জীব মিলখা সিংহ কখনওই এক লাফে ৪৮ নম্বরে উঠে আসতে পারতেন না। তাঁর ভলভো মাস্টার্স খেতাব জয় আর-একবার প্রমাণ করে দিল, তিনি লম্বা দৌড়ের ঘোড়া!

২০০৬ সালটা ব্যাডমিন্টনের বিস্ময়-বালিকা সাইনা নেহওয়ালের। লিখেছেন তানাজী সেনগুপ্ত

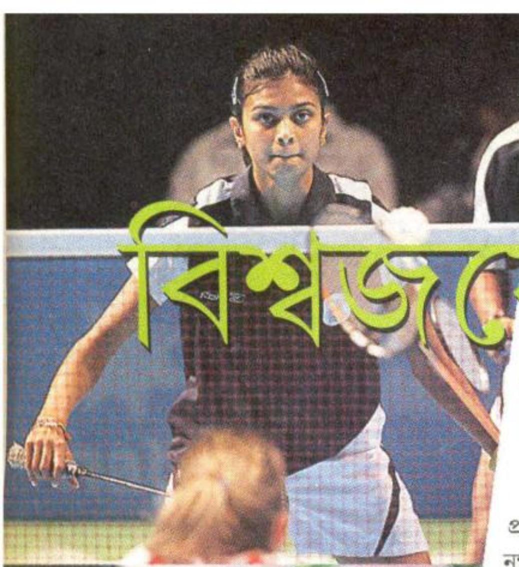

বিশ্বজয়ের স্বপ্নে সাইনা

সপ্তদশী সাইনা ব্যাডমিন্টনের জগতে আলোড়ন ফেলে দিয়েছেন এবার। জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ফাইনালে সদ্য পরাজিত হলেও, তাঁর খেলা বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে প্রবলভাবে। তাঁদের মত, ব্যাডমিন্টনে ভবিষ্যতের সুপারস্টার হতে চলেছেন সাইনা।

এ-বছর সাইনার পারফরম্যান্স দুর্দান্ত। একের পর এক টুর্নামেন্টে নিজের দক্ষতা দেখিয়েছেন তিনি— প্রথমে মে মাসে জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে জেতেন, ফিলিপিন্স ওপেনে হারিয়ে দেন বিশ্বের চার নম্বর জাউ হুয়ানকে। মনে রাখা দরকার, সে সময় সাইনার বিশ্বর্যাঙ্কিং ছিল ১৫০-এর কাছাকাছি। এর পরের দু'টো টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছন তিনি। পরবর্তী বড় জয়, মেলবোর্নে কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের হয়ে দলগত ব্রোঞ্জ পদক লাভ। এই জয়ে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন সাইনা। দক্ষিণ কোরিয়ায় জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সাইনা একে একে হারিয়ে দেন বিশ্বের সেরা ব্যাডমিন্টন তারকাদের, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, চিন ও কোরিয় মেয়েদের। ফাইনালে অবশ্য চিনের ওয়াং ইহানের কাছে হেরে যান। সারা বছরে তাঁর পারফরম্যান্স এবং ফাইনালে ওঠার সুবাদে সাইনার বিশ্বর্যাঙ্কিং ১৫০ থেকে উঠে আসে ৩০-এ। এ-বছরে কোনও মহিলার র্যাঙ্কিং এত দ্রুত বাড়েনি। ফাইনালে খেলা নিয়ে উচ্ছ্বসিত তাঁর কোচ ভারতের কিংবদন্তি তারকা ও অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন পুল্লেলা গোপীচন্দ। হায়দরাবাদের অন্ধ্রপ্রদেশ স্পোর্টস অথরিটি অ্যাকাডেমিতে সাইনাকে প্রশিক্ষণ দেন গোপী। তাঁর কথা, "ওর সামনে দুর্দান্ত ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। ও কোর্টে খুব ফাস্ট। ওর গুণ, কোন শটটা মারতে হবে সেটা ভাল বোঝে। ওর ফিটনেসটা আর-একটু বাড়াতে হবে। তা হলে ওকে রোখা মুশকিল হবে।" সাইনা নিজেও তাঁর দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন। বলেছেন, "ফিটনেস কম বলেই আমি বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে হেরে গেলাম। ফাইনালের আগের ম্যাচগুলোতে এত পরিশ্রম করেছি যে, ফাইনালে দুর্বলতা বোধ করতে থাকি। পা ঠিকমতো পড়ছিল না, ভাল মুভ করতে পারছিলাম না। ১০০ শতাংশ দিতে না পারার জন্যই আমাকে হারতে হল। অনেক নেগেটিভ পয়েন্ট আমি দিতে বাধ্য হয়েছি।" গোপীচন্দর মত, ভাল ফিটনেস ট্রেনিং পেলে অচিরেই এই সব সমস্যা দূর করা যাবে।

ব্যাডমিন্টন সাইনার রক্তে (জন্ম ১৭ মার্চ, ১৯৯০)। তাঁর বাবা হরবীর সিংহ বিজ্ঞানী হলেও ভাল ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় ছিলেন। মা উষারানিও প্রথম শ্রেণির ব্যাডমিন্টন তারকা ছিলেন। দু'জনেই হারিয়ানা রাজ্যচ্যাম্পিয়ন। বাবা হরবীর মেয়ের খেলায় খুশি কিন্তু উচ্ছ্বসিত নন। জানিয়েছেন, মেয়েকে এখনও অনেক দূর যেতে হবে। পরিশ্রমও করতে হবে অনেক। সাইনা নিজেও তা জানেন। তাঁর প্রতিক্রিয়া, "ব্যাডমিন্টন ছাড়া আর কিছু আমি জানি না। তবে রজার ফেডেরার মতো প্রত্যেকটি ম্যাচ আমি জিততে পারব না ঠিকই, কিন্তু লড়াই চালিয়ে যাব।" বছরের শেষে সামান্য বিশ্রাম চান সাইনা। বলেছেন, "এবারের এশিয়ান গেমসের পর ব্যাডমিন্টন থেকে কয়েক দিনের ছুটি নেব। সেসময় আমি মোবাইলটা অফ রাখব। কারণ, প্রতিদিন আমার মোবাইলে অসংখ্য ফোন আর মিসকল আসে।" সাইনা নেহওয়াল যে এখনই স্টার হয়ে গেছেন, তা তাঁর ফোন-কল দেখলেই মালুম হয়!

রাহুল দ্রাবিড়, মহেন্দ্র সিংহ ধোনি বা ইরফান পাঠানরা নন, গত বছরের মতো এবারও বছর শেষের সালতামামিতে শিরোনাম অ-ক্রিকেটারদেরই দখলে! লিখেছেন **সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়**

খেলাধুলোয় একটি বছর

'টিম ইন্ডিয়ার' মহাতারকাদের ঔজ্জ্বল্য, অনেকটাই ম্লান! সচিন, দ্রাবিড়দের তুলনায় জীব মিলখা সিংহ, সমরেশ জঙ্গ, অভিনব বিন্দ্রারা নিতান্তই 'অখ্যাত'! কিন্তু আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারতীয় গল্‌ফার, দাবাড়ু বা শুটাররা অনেকটাই উজ্জ্বল।

ক্রিকেট

ছোটখাটো সাফল্য, বাকিটা শুধুই ব্যর্থতা 'টিম ইন্ডিয়ার'। দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক পর ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে টেস্ট 'রাবার' ছিনিয়ে আনাটা যদি 'দারুণ' হয়, তা হলে ঘরের মাঠে আই সি সি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফির সেমিফাইনালেই উঠতে না পারাটা নিঃসন্দেহে 'নিদারুণ'! বছরের মাঝামাঝি থেকে হঠাৎই একদিনের ক্রিকেটে দ্রাবিড়দের সাফল্যের ভাঁড়ারে টান। লারাদের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে এগিয়ে গিয়েও শোচনীয় পরাজয়, কুয়ালা লামপুরের ত্রিদেশীয় সিরিজে অস্ট্রেলিয়া আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হেরে যাওয়া এবং তারপর অক্টোবরের সেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফির বিষাদ। বছর শুরুর সময় মনেই হয়নি এতটা খারাপ যাবে ওঁদের। একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলোয় যথেষ্টই দাপট দেখিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। পিছিয়ে থেকেও সচিন, দ্রাবিড়, ধোনিদের দৃঢ়তায় পরের চারটি ম্যাচে টানা জয়। ঠিক তার পরের মাসেই অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফের বিপক্ষে একদিনের আন্তর্জাতিকে বিরাট জয়! সেই সময় সত্যি-সত্যিই বিদগ্ধরাও কিন্তু মানতে বাধ্য হচ্ছিলেন, সঠিক পথেই এগোচ্ছে 'টিম চ্যাপেল'! যদিও ভাঙাচোরা, দুর্বল ইংরেজ দলের বিপক্ষে তিন টেস্টের সিরিজ না জিততে পারাটা ছিল অনেকের কাছেই অশনি সংকেতের মতোই। এই মুহূর্তে রাহুলরা দক্ষিণ আফ্রিকায়। অপ্রত্যাশিত ভাল কিছু ঘটলে বিশ্বকাপের আগে অন্তত মানসিকভাবে অনেকটাই চাঙা হয়ে উঠবেন গ্রেগের ছাত্ররা। কিন্তু, বরাবরের মতো এবারও যদি ভরাডুবি হয়? তা হলে কিন্তু আর যাই হোক, লারার দেশে বিশ্বকাপজয়ের স্বপ্নের সলিলসমাধি প্রায় অনিবার্য!

ঝুলন গোস্বামী

পাশাপাশি বেশ কয়েক বছর ধরে টেস্ট ক্রিকেটের 'নুমেরো উনো' অস্ট্রেলিয়া এখন ওয়ান ডে র‍্যাঙ্কিংয়েও এগিয়ে। সকলের উপরে থাকা অজিদের অবশ্য বড় পরীক্ষা বছর শেষের অ্যাসেজে। ১৬ মাস আগে বিলেতের মাটিতে হারানো সম্ভ্রম পুনরুদ্ধারই এখন পন্টিংদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এবছর ক্রিকেট দুনিয়ায় সাড়া ফেলেছে শ্রীলঙ্কা আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নতুন করে মাথা তোলার ক্ষেত্রেও ক্যারিবিয়ানদের সঙ্গে সিংহলিদের বিশেষ তফাত নেই। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফিতে লারাদের লড়াই দেখে গাওস্কর পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন, এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ার পর ক্রিকেট দুনিয়ায় ওরাই দু' নম্বরে! মাহেলা জয়বর্ধনে দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর অন্তত ওয়ান ডে'তে শ্রীলঙ্কা ভালই এগোচ্ছে। আই সি সি'র অফিসিয়াল অ্যানুয়াল অ্যাওয়ার্ডিদের তালিকায় সামনের সারিতে সেই অজিরাই। সেরা টেস্ট ক্রিকেটার আর সেরা টেস্ট ব্যাটসম্যান রিকি পন্টিং, সেরা ওয়ান ডে ক্রিকেটার মাইকেল হাসি।

জুলাইয়ে ইংল্যান্ডের মাটিতে তিন টেস্টের সিরিজে মিতালির দলের ঐতিহাসিক জয় এদেশে মেয়েদের ক্রিকেটে গুরুত্বপূর্ণ বাঁক এনে দিয়েছে। সেই সিরিজ জয়ে এক বঙ্গললনার ভূমিকা কম ছিল না। তাই ঝুলন গোস্বামীই ২০০৬ সালে বাংলার ক্রিকেটের সেরা 'ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর'।

বছর শেষে ক্রিকেটে কলঙ্কের অধ্যায় জুড়লেন দুই পাক পেসবোলার। শোয়েব আখতার আর মহম্মদ আসিফ। নিষিদ্ধ ওষুধ সেবনের দায়ে ২০০৭ সালে ক্রিকেট মাঠে দেখা যাবে না ওঁদের।

ফুটবল

ভাইচুংরা যাই করুন, বছর শেষে ফুটবলের 'সাম আপ' করতে চাইলে সেই রোনাল্ডিনহো, ক্রেসপো, কাকা, এসিয়েনরাই বারবার সামনে চলে আসবেন। এশিয়া কাপের কোয়ালিফাইং রাউন্ডে জাপান আর সৌদি আরবের কাছেই হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে মিলিয়ে চার ম্যাচে যাঁরা ১৯টি গোল খেয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে ভাল কিছু লেখা যায় কি? স্টিফেন কনস্টানটাইন সরে যাওয়ার পর এই বছরই আরও এক নতুন বিদেশি কোচ বব হটন এসেছেন ভারতীয় ফুটবলে। এখনও ভারতীয় ফুটবলের পরিকাঠামো সেই ক্লাবনির্ভরতা থেকে বেরোতে পারেনি। ২০০৬-এ অবশ্য একটু স্বাদ বদল ব্যারেটো সমৃদ্ধ মাহীন্দ্রা ইউনাইটেডের জাতীয় লিগজয়ে। সুপার কাপ অবশ্য গিয়েছে সেই গোয়াতেই।

বছরটা ছিল 'ওয়ার্ল্ড কাপ ইয়ার'। শুরুর আগে মিডিয়ার গরিষ্ঠ অংশ রোনাল্ডিনহোদের হাতে 'সোনার পরি' তুলেই দিয়েছিল। চ্যাম্পিয়ন হওয়া দূর অস্ত, সাম্বা ফুটবলের আগুন নিভল কোয়ার্টার ফাইনালেই, অনেক বেশি চমক দিল 'আন্ডারডগ'রা। কেউ পাত্তা দেননি প্রথম দিকটায়, অথচ শেষমেশ ফিগো, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, মানিচ, লাম, বালাক, পোডোলস্কিরা সেমিফাইনাল খেলে ফেললেন। মনে রাখার মতো ফাইনাল এবং শুধু বল পায়ে নয়, লড়াই বল ছাড়াও! মাতোরাজ্জিকে জিদানের সেই ঢুঁসোও এখন বিশ্বকাপের ইতিহাসে! পেলে, বোকেনবাওয়াররা আগেই বলেছিলেন যে, ইদানীংকালে মিশেল প্লাতিনিও স্বীকার করে নিয়েছেন, জিনেদিন জিদানই ছিলেন এই প্রজন্মের সেরা ফুটবলার। ঝাঁ-চকচকে কেরিয়ারগ্রাফ, অসাধারণ সাফল্য ক্লাব ফুটবলে দেশের হয়েও! সেই 'জিজু' যে কারও-কারও কাছে এভাবে 'নিন্দিত' হয়ে পড়বেন শেষবেলায়, সেকথা ভাবেননি তাঁর অনুরাগীরাও। ইতালির চতুর্থ বিশ্বকাপ জয়ের নেপথ্যে রইল এমন কয়েকটি নাম, যাঁরা আগামী দিনে ফুটবল দুনিয়া শাসন করবেন। পিরলো, মাতোরাজ্জি, জিলারদিনো, লুকা টোনি। ক্লাব ফুটবলে রোনাল্ডিনহো, ডেকো, স্যামুয়েল এটো'র বার্সেলোনাকেই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়েছে। লা লিগা আর উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ একই সঙ্গে বড় দু'টো খেতাব জিতে বার্সা টেক্কা

বিশ্বকাপ হাতে ইতালি

দিয়েছে চেলসি, এ সি মিলানের মতো ইউরোপের অন্য সেরা ক্লাবগুলোকেও। পাশাপাশি এই ২০০৬ দেখল 'আজুরি' ফুটবলের সম্পূর্ণ বিপরীত দু'টো ছবি। একটা অন্ধকারময়, ম্যাচ গড়াপেটার দায়ে অভিযুক্ত জুভেন্তাসের সেরি-আ খেতাব কেড়ে নিয়ে তাদের সেরি-বি-তে নামিয়ে দেওয়া। এমনকী, রোমা বা এ সি মিলানের মতো ইতালির সেরা ক্লাবগুলোকেও শাস্তির আওতায় এনে ফেলা। এবারের বিশ্বকাপ দেখল ফিগো, বেকহ্যাম, রাউল, রোনাল্ডো, বালাকদের মতো অনেক মহাতারকারই প্রস্থান। তবুও জিদানের জন্যই কেন যে মনটা কেমন করে, কে জানে!

শুটিং-গলফ-দাবা-অ্যাথলেটিক্স...

অভিনব বিন্দ্রার বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব, পরিমার্জন নেগি'র সাড়ে তেরোতেই কিস্তিমাত বা জীব মিলখা সিংহের ইউরোপিয়ান সার্কিটে বড় জয়। অ্যাথলেটিক্সে বঙ্গতনয়া পিঙ্কি প্রামাণিকের পারফরম্যান্স এশিয়াডের আগে আশ্বস্ত করেছে বিশেষজ্ঞদের।

তবে সত্যি-সত্যিই কমনওয়েলথে 'ডার্লিং অফ দ্য ক্রাউড' ছিলেন ভারতীয় শুটাররা। অভিনব বিন্দ্রা, মানবজিৎ সিংহদের মতো কমবয়সিদেরও ছাপিয়ে গেলেন দিল্লির এক সুদর্শন মধ্যবয়স্ক। সমরেশ জঙ্গ। একটা-দু'টো নয়, পাক্কা ছ'টি সোনা গলায় ঝুলিয়ে গেমসের সেরা ক্রীড়াবিদও নির্বাচিত হলেন তিনিই। বছরের মাঝামাঝি ক্রোয়েশিয়ায় জাগ্রেবে আই এস এস এফ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অভিনব বিন্দ্রার খেতাব জয়ও ইতিহাস। রেকর্ডবুক বলছে, এর আগে আর কোনও ভারতীয় শুটার বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ থেকে সোনা আনতে পারেননি।

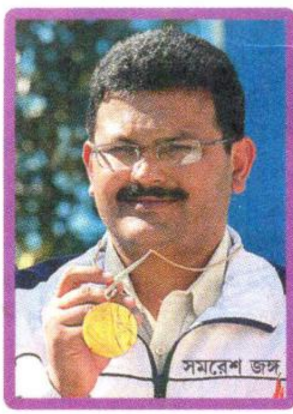
সমরেশ জঙ্গ

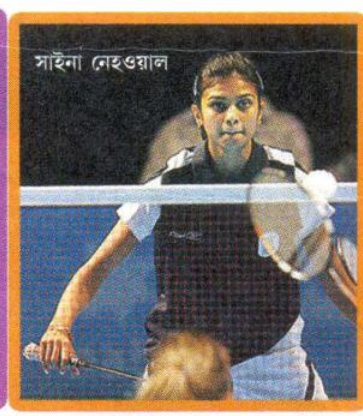
সাইনা নেহওয়াল

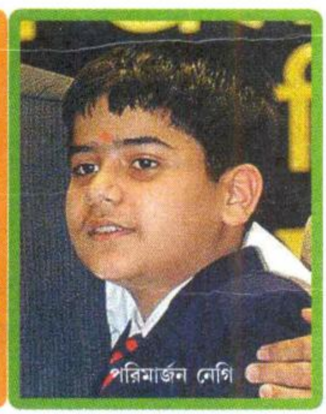
পরিমার্জন নেগি

দাবায় এই মুহূর্তে গ্র্যান্ডমাস্টার হয়ে গোটা বিশ্বের চোখ কপালে তুলে দিয়েছেন পরিমার্জন নেগি। ইউক্রেনের সের্গেই কর্জাকিনের পর দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ গ্র্যান্ডমাস্টার বিশ্বে এখন পরিমার্জনই।

বছর জুড়ে তাঁর র‍্যাকেট ধারাবাহিকতাহীন। ২০০৬ নতুন করে ফের বোঝাল, যতই লাফালাফি হোক, সানিয়া মির্জার সীমাবদ্ধতা প্রচুর। এভাবে চললে ডব্লিউ টি এ ক্রমতালিকার প্রথম দশে ঢুকে পড়ার স্বপ্নটা স্বপ্নই থেকে যাবে। ২০০৭ সালটা সত্যি-সত্যিই হায়দরাবাদি তনয়ার কেরিয়ারের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। র‍্যাঙ্কিংয়ে পিছোতে-পিছোতে সানিয়া (এই লেখার সময় পর্যন্ত) ৬৯ নম্বরে। জানুয়ারিতে মেলবোর্ন পার্কে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপে কিছুটা এগোতে পারলেও মানসিকভাবে খানিকটা চাঙা হবেন। সানিয়া উত্তাপহীন, মহেশ ভূপতিও বছরের শুরুতে অজি ওপেনে মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার সঙ্গে জুটি বেঁধে মিক্সড ডাবল্‌স-এ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সেভাবে ঝলসে উঠতে পারলেন না। বছরের শেষ পর্বে আর্কলাইটের দখল নিলেন আমাদের প্রিয় লিয়েন্ডার। মার্টিন জ্যামের সঙ্গে জুটিতে ফ্লাশিং মিডো'য় ইউ এস ওপেনের ডাবল্‌স ট্রোফি লি'র কেরিয়ারে নতুন করে গতি আনল। যদিও তার পরেই পুরনো পার্টনার হেশে'র সঙ্গে কাজিয়াটা ভাল লাগেনি কারওরই।

ফুটবল বিশ্বকাপের কয়েক মাস পরে সেই জার্মানিতেই হকির বিশ্বকাপ। কঠিন গ্রুপেই ছিলেন দিলীপ তিরকে'রা। কিন্তু গোটা বিশ্বকাপে মাত্র একটা জয়, তা-ও আবার সেটা একাদশ-দ্বাদশ স্থান নির্ণায়ক প্লে অফ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।

শুটিং ছাড়া যে খেলায় একাধিক ভারতীয় নাম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, সেটা গলফ। গত পাঁচ-ছ' বছরে জীব মিলখা সিংহ, জ্যোতি রানধাওয়া, অর্জুন অটওয়ালরা বারবার গর্বিত করেছেন আমাদের। শিব কপূর, আমনদীপ জোহল বা চৌরাশিয়াদের মতো তরুণরাও যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, তার প্রমাণও মিলছে। দীর্ঘ সাত বছরের ট্রোফির খরা কাটিয়ে এপ্রিলের চিনা ওপেনের ট্রোফি ফের কক্ষপথে ফেরাল মিলখা পুত্রকে। অক্টোবরের শেষাশেষি স্পেনের ভালদেরামায় ভলভো মাস্টার্স ওপেনে অবিশ্বাস্য জয়।

জীব, সমরেশ বা অভিনবদের মতো পোড় খাওয়া আন্তর্জাতিক তারকাদের ঔজ্জ্বল্যের পাশে ভুললে চলবে না সাইনাকে! বছর শুরুর সময় প্রথম একশো'র বাইরে ছিলেন, কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর র‍্যাঙ্ক তিরিশের আশপাশে। বিশ্বসেরা হতে না-ই পারুন, সাইনা অন্তত বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি লম্বা দৌড়ের ঘোড়া!

পরিমার্জন নেগির পর ছেলে ও মেয়েদের বিভিন্ন ক্যাটিগরি মিলিয়ে এবার মোট পাঁচটি সোনা এসেছে ভারতে। অনূর্ধ্ব আট আর অনূর্ধ্ব দশ, দুই বিভাগের চারটি সোনাই পেয়েছে ভারতীয় দাবাড়ুরা। তবে সবচেয়ে উল্লেখ্য অনূর্ধ্ব আঠারো বিভাগে দ্রোনাভাল্লি হারিকার জয়। সি, মোহিনীশ, গিরিশ কৌশিক, ইভানা ফাতার্দো বা সহেজশ্রী তো আসলে ভারতীয় দাবার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ!

স্কুল ক্রিকেটে বিরল রেকর্ড

কে জানত এমন অবিশ্বাস্য বিশ্বরেকর্ড করে ইতিহাস গড়ে ফেলবে ওরা। সেন্ট পিটার্স স্কুলের অষ্টম শ্রেণির এই দুই খুদে ক্রিকেটারকে ঘিরে উচ্ছ্বাস বাড়াটাই স্বাভাবিক। স্কুল ক্রিকেটে সেন্ট ফিলিপস হাই স্কুলের বিরুদ্ধে ইনিংস শুরু করতে নেমে বি মনোজ কুমার ও মহম্মদ শাইবাজ টুম্বির ওপেনিং জুটি মাত্র ৪০ ওভারে ৭২১ রানের পার্টনারশিপ খেলে এমন নজির গড়েছে যা ক্রিকেট ইতিহাসে কখনও ঘটেনি। আর এই রেকর্ড গড়তে গিয়ে ওরা ভেঙে দিয়েছে ১৯৮৮-তে মুম্বইয়ের সারদাশ্রম বিদ্যামন্দিরের হয়ে সচিন তেন্ডুলকর ও বিনোদ কাম্বলির গড়া ৬৬৪ রানের বিশ্বরেকর্ড। এক ইনিংসে মনোজের ৩২০ ও শাইবাজের ৩২৪ রানের অপরাজিত জোড়া ট্রিপল সেঞ্চুরি সীমিত ওভারের ক্রিকেটে এই প্রথম। আবার প্রতিপক্ষ দল মাত্র ২১ রানে অল আউট হয়ে যাওয়ায় ৭০০ রানের বৃহত্তম ব্যবধানে ম্যাচ জয়ের ঘটনাও ক্রিকেট ইতিহাসে আগে ঘটেনি।

এশীয় দাবায় চ্যাম্পিয়ন মেরি অ্যান গোমস

সদ্য মেয়েদের এশীয় জুনিয়র দাবায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরলেন কলকাতার মেয়ে মেরি অ্যান গোমস। চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে ভারতেরই কিরণ মনীষা মোহান্তি ও লক্ষ্মী সাহিতিকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন তিনি। চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে অর্জন করেছেন দ্বিতীয় জি এম নর্ম। অর্থাৎ এবার আর একটি জি এম নর্ম পেলেই নিশা মোহতার পর দ্বিতীয় মহিলা গ্র্যান্ড মাস্টার পাবে বাংলা। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ গ্র্যান্ড মাস্টার নাইজেল শর্টের প্রশংসা আদায় করে নিয়েছেন গোমস। দিব্যেন্দু বড়ুয়ার চেস আকাদেমির এই ছাত্রীটির লক্ষ্য, আসন্ন কমনওয়েলথ দাবায় তৃতীয় জি এম নর্ম তুলে নিয়ে গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়া।

বর্ষসেরা পাওয়েল

এবার আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স সংস্থার বিচারে বর্ষসেরা অ্যাথলিট নির্বাচিত হলেন জামাইকার আসাফা পাওয়েল। বিশ্বের দ্রুততম এই অ্যাথলিট ৯.৭৭সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন। ১০০ মিটারে তিনি দু'-দু'বার বিশ্বরেকর্ড করেন। শুধু তাই নয়! ২৩ বছরের এই দুরন্ত অ্যাথলিট মোট ১৬টি রেস জিতেছেন। একই সঙ্গে মেয়েদের মধ্যে বর্ষসেরা হয়েছেন আমেরিকার ২১ বছর বয়সি অ্যাথলিট, ৪০০ মিটারে নতুন বিশ্বরেকর্ডের মালিক সানিয়া রিচার্ডস।

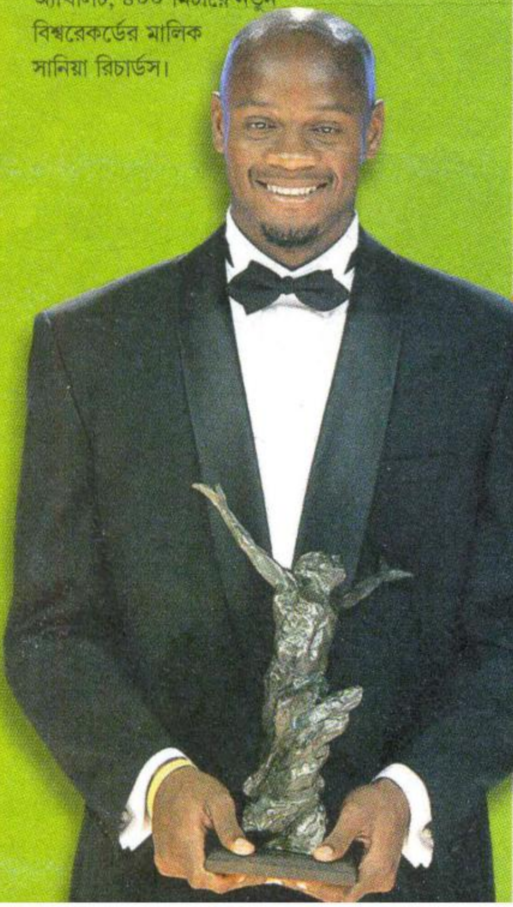

ছোটদের পাশে লিওনার্দো

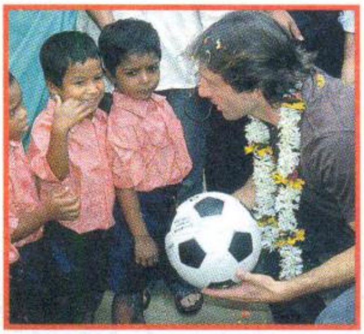

একঝাঁক কচিকাঁচার সঙ্গে মেতে রইলেন কিছুক্ষণ। অকাতরে অটোগ্রাফ বিলোলেন। ছোটদের সঙ্গে ফুটবল, বাস্কেটবল, টেবল টেনিস, ক্যারম খেলে ওদের মন জয় করে নিলেন। ব্যারাকপুর উদয়নের গৃহহীন অনাথ শিশুরা পেল অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার স্টিভওয়র মতো আরও এক দাদাকে। ১৯৯৪ বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিল দলের ফুটবলার লিওনার্দো ডি' আরাউজো গত বছর নভেম্বরে এ সি মিলানের জুনিয়র দলের সঙ্গে কলকাতায় এসে উদয়নকে ভালবেসে ফেলেন। গত এক বছর উদয়নের উন্নতিকল্পে তিনি বেশ কিছু অর্থও দান করেন। এবার উদয়নে এ সি মিলান ফাউন্ডেশনের পরিচালনায় একটি ইন্ডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করে গেলেন। ফিরে যাওয়ার আগে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতিতে প্রয়োজনে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়ে গেলেন লিওনার্দো।

মত পালটালেন মহেশ

শেষ পর্যন্ত দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সিদ্ধান্ত নিলেন টেনিস তারকা মহেশ ভূপতি। দোহা এশিয়ান গেমসে মিক্সড ডাবলসে লিয়েন্ডারের সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলবেন সানিয়া মির্জা। মাস দুই আগে তাঁকে অন্ধকারে রেখে টেনিস ফেডারেশন এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ায় মারাত্মক চটে গিয়েছিলেন মহেশ। সংবাদ মাধ্যমের কাছে দেশের হয়ে না খেলার কথা জানিয়েছিলেন তিনি। অবশেষে মত বদলালেন মহেশ,। তাঁর সাফ কথা, "পুরনো সিদ্ধান্তকে আঁকড়ে থাকার কোনও মানে হয় না। বলতে পারেন, দেশের হয়ে খেলার তীব্র ইচ্ছাই আমাকে সিদ্ধান্ত বদলে বাধ্য করল।"

চন্দন রুদ্র

IPSA

ইরেজার ত্বক পরিচর্যা ও ব্যক্তিগত পরিচর্যা সম্ভার দিয়ে রূপ-লাবণ্যে আনুন নতুন মাত্রা

ANANDAMELA DECEMBER 2006 REGD. NOS. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/2004-06 & SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/FGN-20/2004-06 RNI NO. 27057/75 LPWP NOS. SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/LPWP-19/2004-06 & SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/FGN-06/LPWP-FGN-02/2004-06 INR 10.00

Dabur

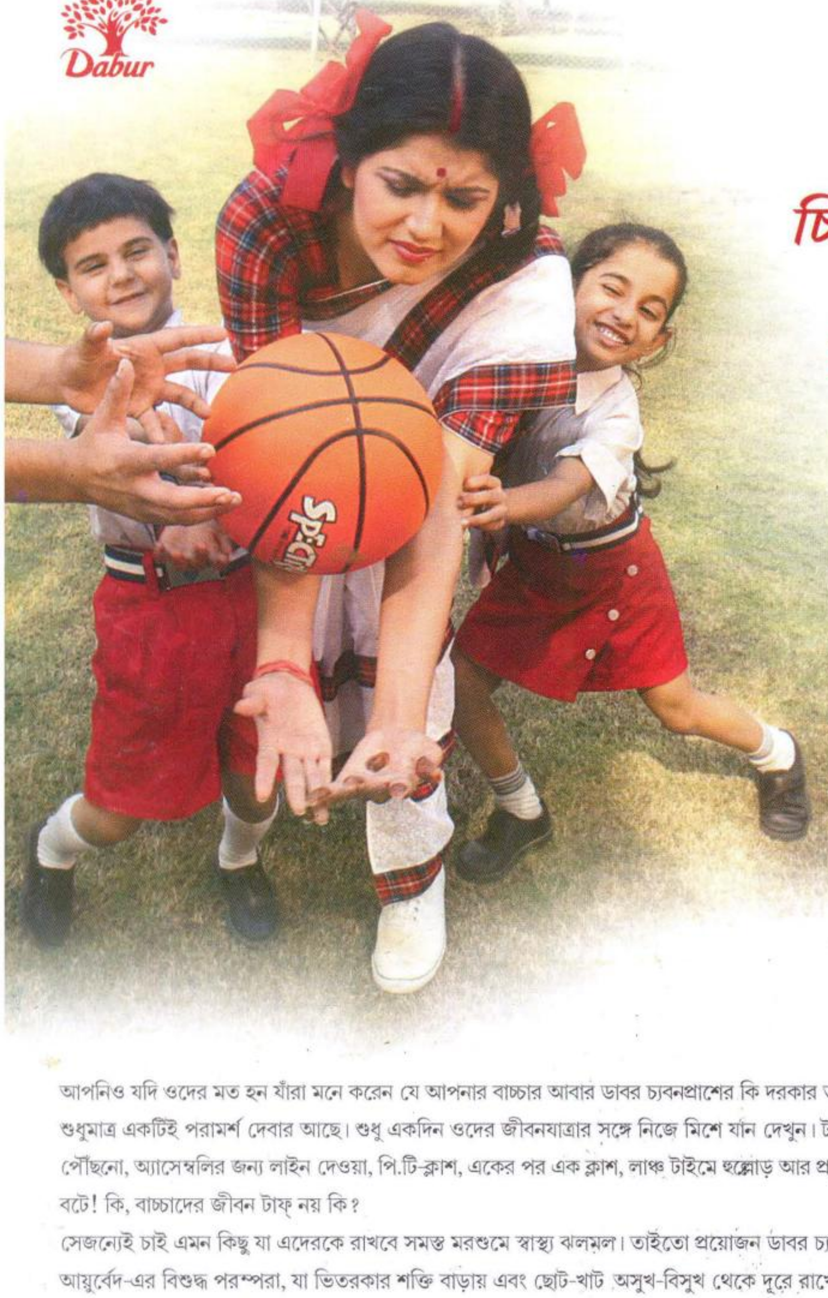

চিন্টুর ডাবর চ্যবন প্রাশের
কি দরকার!
চলুন না আজ মা-কেই
স্কুলে পাঠানো যাক!

আপনিও যদি ওদের মত হন যাঁরা মনে করেন যে আপনার বাচ্চার আবার ডাবর চ্যবনপ্রাশের কি দরকার তাহলে আমাদের শুধুমাত্র একটিই পরামর্শ দেবার আছে। শুধু একদিন ওদের জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজে মিশে যান দেখুন। টাইমে স্কুলে পৌঁছনো, অ্যাসেম্বলির জন্য লাইন দেওয়া, পি.টি-ক্লাশ, একের পর এক ক্লাশ, লাঞ্চ টাইমে হুল্লোড় আর প্রচুর হোমওয়র্কও বটে! কি, বাচ্চাদের জীবন টাফ্ নয় কি?

সেজন্যেই চাই এমন কিছু যা এদেরকে রাখবে সমস্ত মরশুমে স্বাস্থ্য ঝলমল। তাইতো প্রয়োজন ডাবর চ্যবনপ্রাশের। আয়ুর্বেদ-এর বিশুদ্ধ পরম্পরা, যা ভিতরকার শক্তি বাড়ায় এবং ছোট-খাট অসুখ-বিসুখ থেকে দূরে রাখে তার সাথেই দেয় ভরপূর শক্তি ও স্ট্যামিনা। এতে আছেঃ-

আমলাঃ ভিটামিন সি-এর ভরপূর উৎস। আমলা আমাদের শরীরকে দৈনন্দিন অসুখ-বিসুখের হাত থেকে বাঁচায়।

কৃকটশৃঙ্গীঃ এটি বার-বার হওয়া সর্দি-কাশি-র জন্য উপকারী।

বলা/বিদারীকন্দঃ এটি দুর্বলতাকে দূর করে শরীরে শক্তি প্রদান করে। এ ছাড়া এটি অনেক স্বাস্থ্যবর্ধক উপাদানের অভিনব সংমিশ্রণ। সেজন্য বাচ্চাই হোক বা বড়, ডাবর চ্যবনপ্রাশ প্রত্যেকের জন্যেই খুবই উপকারী। এবার তো নিশ্চয়ই বোঝাগেল যে আপনার চিন্টুর ডাবর চ্যবনপ্রাশ কেন প্রয়োজন।

McCann/DCP/10/06

Dabur
Chyawanprash
দরকার আছে!

বিশদ বিবরণের জন্য আমাদের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞকে androonishakti@dabur.com তে ই-মেইল করুন,
লগ-অন করুন www.dabur.com/chyawanprash অথবা ডাবর চ্যবনপ্রাশ পো.অ.বক্স 3, সাহিবাবাদ, গাজিয়াবাদ-201010 কে লিখুন।
*1 কেজি ডাবর চ্যবনপ্রাশের সঙ্গে 45 গ্রা. ডাবর হনি বিনামূল্যে!